প্রাণাধিক শ্রীমান্ সৌম্যেন্দ্রনাথকে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

স্নেহের উপহার

দিলাম।

বাবা।

১১ই বৈশাখ, ১৩১৭।

প্রকাশকের নিবেদন।

একটি ব্যতীত এই পুস্তকের সকল গল্পগুলিই মাসিকপত্রে পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। পূজনীয় লেখক মহাশয় আমাকে এই গল্পগুলি একত্র করিয়া প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়া চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। "পিতা ও পুত্র" গল্পটির শেষাংশ লেখক মহাশয় সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন—এই পরিবর্ত্তনে গল্পটির করুণ রস এতই ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, চোখের জল সংবরণ করা যায় না। এক্ষণে গল্পগুলি পাঠকদিগের মনোরঞ্জন করিতে পারিলে সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি

১২ই বৈশাখ, ১৩১৭।

চিত্রলেখা।

স্নেহের জয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গিন্নি। শুন্‌লুম আজ জামাই এসেছিল না কি,—বাড়ীর ভিতর দেখা না করে' গেল যে?

কর্ত্তা। তার নাম আর মুখে এনো না! অকালকুষ্মাণ্ড ছোঁড়াটার অহঙ্কারে মাটীতে আর পা পড়ে না!—আমি এত করে' বল্‌লুম, অবস্থা যখন ভাল নয়, তখন এইখানেই এসে বরাবর থাকুক্—বেটা কোন মতেই রাজী হ'ল না, বল্লে কি না, এক মাসের মধ্যে যদি মেয়েকে না পাঠান হয়, তবে আর একটা

বিয়ে করবো।—আমি বলে' দি... ...ার যটা ইচ্ছে বিয়ে করুক্ গে, আমি মেয়েকে কোন মতেই পাঠাব না। হারামজাদা!

গিন্নি। শ্বশুর জামাইয়ে ঝগড়া, এ দিকে মেয়েটা যে দগ্ধে গেল।

কর্ত্তা। তা' আমি কি কর্‌ব। বেটার নিজের পেটের ভাত জোটে না—মেয়েকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াবে কি?

গিন্নি। তাদের অবস্থা মন্দ হ'লেও মোটা ভাত কাপড় দিয়ে মেয়েকে পুষতে পারে, এমন সঙ্গতি আছে গো। তার যখন ঘরজামাই থাক্‌তে এতই অনিচ্ছে, তখন তুমি না হয় মেয়ের নামে দশ বিশ হাজার টাকা ও একখানা ভাল বাড়ী করে' দাও না,—শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে তোমার ত অভাব নেই। মে... মুখের দিকেও ত একবার তাকাতে হয়—স্বামী নিয়ে তাকেও ত ঘর করতে হবে।

কর্ত্তা। সবই বুঝি। রাণুর জন্যে আমি

সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু ও বেটার জেদ যে বজায় থাক্‌বে, এ আমি কোন মতেই সহ্য করতে পারব না। এ পর্য্যন্ত আমার মতের বিরুদ্ধে কেউ একটি কথাও কইতে সাহস করে নি—ঐটুকু ছোঁড়ার এত বড় সাহস! কখনই মেয়েকে পাঠাব না! তাকে এখানে আন্‌ব, তবে ছাড়ব! তোমরা মেয়ে-মানুষ, এ সব বিষয়ে কোন কথা বোলো না।

"শেষকালে পস্তাতে হবে, এই বলে' রাখলুম"—এই বলিয়া গৃহিণী ক্রোধভরে বিষণ্ণ-মনে চলিয়া গেলেন।

তখন বেলা প্রায় দশটা। বৃদ্ধ জমীদার গোপাল রায় উপরে বৈঠকখানায় বসিয়া খবরের কাগজখানির আদ্যোপান্ত পাঠ শেষ করিয়া জমীদারী কাগজপত্রে মনোনিবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন—এমন সময়ে প্রথমে জামাতা এবং তৎপরে গৃহিণী আসিয়া উক্তভাবে তাঁহার মনকে উত্ত্যক্ত করিয়া গেল।

গোপাল রায় তামাক টানিতে টানিতে পঠিত খবরের কাগজখানা পুনরায় নাসিকাগ্রভাগে তুলিয়া ধরিলেন। যে কেহ তাঁহার তখনকার মুখের ভাব দেখিলেই বুঝিতে পারিত যে, তাঁহার দৃষ্টি খবরের কাগজের দিকে সরল রেখায় থাকিলেও, তাঁহার মন কিন্তু অন্যদিকে ছিল।

গোপাল রায় শাঁখালির মস্ত জমীদার। তাঁহার জমীদারী যেমন সুবিস্তৃত ছিল, তাঁহার ক্ষমতারও তেম্‌নি সীমা ছিল না। প্রজাবৃন্দ ও গ্রামস্থ অন্যান্য সকলেই তাঁহাকে ভয় ও মান্য করিয়া চলিত,—ইহার কারণ, বিষয়কর্ম্মে রায় মহাশয় যেমন কড়া ছিলেন—নিক্তির ওজনে কড়ায় গণ্ডায় সমস্ত পাওনা বুঝিয়া লইতেন, তেম্‌নি আবার লোকের বিপদ আপদে মুক্ত-হস্তে প্রাণপণে সাহায্য করিতেন। রায় মহা-শয়ের একটি প্রধান দোষ ছিল যে, তিনি তাঁহার মতের বিরুদ্ধতা কোনও মতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। কেহ তাঁহার বিরুদ্ধতা

করিলে তাহার ভিটা পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন না করিয়া ছাড়িতেন না।

বৃদ্ধের এই স্বেচ্ছাচারী গর্ব্বিত মন জামাতার নিকটে আজ প্রথম বাধা প্রাপ্ত হইয়া রুদ্ধ আক্রোশে গর্জ্জিতে লাগিল। দরিদ্রতনয় বিধুভূষণের সঙ্গে যখন প্রাণাধিকা একমাত্র কন্যা রাণীর বিবাহ দিয়াছিলেন, তখন বৃদ্ধ মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, বিবাহের পরেই জামাতাকে ঘরে আনিয়া রাখিবেন,—স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, গরীবের ছেলের এতটা স্পর্দ্ধা হইবে যে, তাঁহার বাটীতে থাকিতে অসম্মতি প্রকাশ করিবে। এইজন্য বিবাহের পূর্ব্বে বৃদ্ধ এ বিষয়ে কোন কথাই উত্থাপন করা একেবারে অনাবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। এক্ষণে বৃদ্ধের চমক ভাঙ্গিল, দেখিলেন, মনের গতি সর্ব্বত্র অবাধ নহে—বুঝি বা এত দিনের পর নব্যযুবক জামাতার নিকটে তাঁহাকে সম্পূর্ণ পরাস্ত হইতে হয়—বিদ্রোহী জামাতাকে

দমন করিবার জন্য তাঁহার শরীরের সমস্ত রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। অন্যদিকে কিন্তু মন আবার জীবনের একমাত্র বন্ধন স্নেহময়ী বালিকা কন্যার দিকে টানিতে লাগিল। বৃদ্ধ কন্যাকে যেরূপ ভালবাসিতেন, সচরাচর পিতা কন্যাকে এরূপ ভালবাসেন না। রাণী যে তাঁহার কি ছিল, বলা কঠিন। তাহার কষ্ট হইবে ভাবিয়াই ত দরিদ্র স্বামীর গৃহে তাহাকে পাঠাইতে বৃদ্ধের এত অনিচ্ছা,—কিন্তু এক্ষণে যদিও মনে মনে বুঝিলেন, স্বামী হইতে পৃথক্ হইয়া থাকা অপেক্ষা দরিদ্র স্বামীর গৃহে বাস করাই কন্যার পক্ষে ভাল, তবুও চিরাভ্যস্ত জেদ বজায় রাখিতে গিয়া বৃদ্ধ আর সমস্ত ভুলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এক মাস পরে একদিন অপরাহ্নে ঝি দোকান হইতে ফিরিয়া রাণীর হাতে একখানি

চিঠি দিল। রাণী তাড়াতাড়ি চিঠিখানি খুলিয়া পড়িল। লেখা ছিল, "রাণী, তুমি যদি আমাকে চাও ত পত্রপাঠ এখানে আসিবে। তোমাদের বাড়ীর চারি পাঁচখানা বাড়ী পরে আমার বন্ধু ঘোষেদের বাড়ীতে আমি আছি। ঝিকে বলিলেই সে বাড়ী চিনাইয়া দিবে। যদি না এস, জানিব, তুমি আমাতে আসক্ত নও। আমি আর তোমাদের বাড়ী যাইতেছি না। ইতি বিধুভূষণ।"

রাণী তাড়াতাড়ি মায়ের কাছে ছুটিয়া গিয়া চিঠির কথা বলিল। মাতা স্নেহবিগলিতস্বরে ছলছলনেত্রে কহিলেন, "আমি কি করব বল্ মা, তোর বাবার মত না হ'লে ত আর কিছু হবে না,—তিনি যে জেদ ধরেছেন!—"

"বাবার মত না হ'লে হবে না?—আচ্ছা।"—এই বলিয়া রাণী তাড়াতাড়ি উপরে চলিয়া গেল। তাহার শয়নকক্ষে ঢুকিয়া আলমারী হইতে গহনাপত্র বাহির করিয়া একে

একে সবগুলি পরিল,—বিবাহে শ্বশুরবাটী হইতে প্রাপ্ত ঢাকাই শাড়ীখানা অঙ্গে জড়াইল, এবং অবশিষ্ট কাপড় জিনিসপত্র ইত্যাদি গুছাইয়া বাক্সে ভরিল। সব ঠিক করিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া একেবারে বাহিরে পিতার সমক্ষে গিয়া ঢিপ্ করিয়া একটি প্রণাম করিল। বৃদ্ধ তখন আফিঙ্গের ঝোঁকে ঢুলিতে-ছিলেন। চমক ভাঙ্গিয়া উঠিয়া সুসজ্জিতবেশে কন্যাকে সম্মুখে দেখিয়া হতবুদ্ধিভাবে কহিলেন, "অ্যাঁ! এ কি! কোথায় যাস্?"

রাণী কহিল, "শ্বশুরবাড়ী যাব বাবা।"

বৃদ্ধ। শ্বশুরবাড়ী? কি বল্‌চিস্?

রাণী আস্তে আস্তে কহিল, "তিনি আমাদের বাড়ীর কাছে ঘোষেদের বাড়ীতে আছেন। আমাকে যাবার জন্য চিঠি দিয়াছে। আমাকে লইয়া আমার শ্বশুরবাড়ীতে রাখিয়া আসিবেন।—"

বৃদ্ধ উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "দূর হ! দূর হ!

আমার সম্মুখ হইতে দূর হ!—আমার সমস্ত গহনাপত্র রাখিয়া তোর যেথানে ইচ্ছা যা।”—বলিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

রাণী সাশ্রুনয়নে পুনর্ব্বার পিতাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতরে গিয়া গা হইতে সমস্ত গহনাপত্র খুলিয়া আলমারীতে তুলিয়া রাখিল,—হাতে কেবলমাত্র একগাছি কাঁচের চুড়ি রহিল। বাক্স-বোঝাই কাপড় জিনিসপত্র যাহা লইয়াছিল, সব রাখিয়া দিল। তাহার পর দীন-বেশে কাঁদিতে কাঁদিতে মাকে গিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, “মা, আমি চল্‌লুম।”

মা বলিলেন, “এ কি বেশে শ্বশুরবাড়ী যাচ্চিস্ রাণু, চল মা, গহনাপত্র দিয়ে ভাল করে’ সাজিয়ে দিই।”

রাণী কহিল, “না মা, তুমি জান না, বেশী সাজগোজ বড়মানুষী দেখে হয় ত তিনি আবার রেগে যাবেন—গরীববেশেই যাও-

ম্নাই ভাল।”—আসল কথা মাকে জানিতে দিল না।

মাতা বুঝিলেন, কন্যা বুঝি অনেক কষ্টে পিতার মত করিতে পারিয়াছে—এই কারণে বিচ্ছেদের অতি তীব্র যন্ত্রণার মধ্যেও কথঞ্চিৎ শান্তি অনুভব করিলেন, বুক ফাটিয়া যাইলেও আপনাকে যথাসাধ্য সংযত করিয়া কন্যাকে বুকের মধ্যে টানিয়া মুখচুম্বন পূর্ব্বক স্নেহাশীর্ব্বাদে সিঞ্চিত করিলেন।

পূর্ব্ব হইতেই রাণী পাল্কীর বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল; কাঁদিতে কাঁদিতে পাল্কীতে গিয়া উঠিল। দাসী সঙ্গে গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিধুভূষণ রাণীকে সঙ্গে লইয়া জয়নগরে দেশের বাটীতে পৌছিলে তাহার মাতাঠাকুরাণী বউকে নিরাভরণা দেখিয়া সপ্তমে গলার আওয়াজ চড়াইয়া কহিলেন, “ও মা কি হবে!

জমীদারের ঝির এই সাজ! আমরা চোর না ডাকাত যে, গয়না কেড়ে নেব!—গরীব বলে' এত তাচ্ছীল্য!—ওগো! আমাদেরও এককালে সব ছিল—সব ছিল!"—

বিধুভূষণ মাতাকে থামাইয়া কহিল, "মা তুমি চুপ্ কর, বউ ইচ্ছে করে' গহনাপত্র সব রেখে এসেছে—আমি যখন দিতে পারব, তখন পরবে। এখন বউকে কিছু খেতে দাও, পথে বড় কষ্ট হয়েচে।"

"বউ না হয় ছেলেমানুষ, বুড়ো মাগী মিন্সেরও কি আক্কেল নাই—মেয়েকে এই রকম করে' শ্বশুরবাড়ী পাঠায়!—লজ্জায় মরে' যাই যে—কি হ'বে গো! একালের ছেলেরা আবার বউয়ের দিকে টানে!"—বলিতে বলিতে মাতাঠাকুরাণী রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন।

পথশ্রমে বিধুভূষণ রাণী উভয়েই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল—আহারাদির পরই শয়ন করিল। ইহার নিমিত্তও পরদিন প্রাতে শ্বশ্রূ-

ঠাকুরাণীর নিকট হইতে রাণীকে অনেক গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছিল।

বিধুভূষণের সংসারে বৃদ্ধা মাতা ও এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছাড়া অন্য কেহ ছিল না। অনেকদিন পূর্ব্বে বিধুভূষণের পিতার কাল হয়। পিতা পৌরোহিত্য করিয়া সংসার চালাইতেন। অল্প স্বল্প জায়গা জমী ভিন্ন আর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই—দুই চারি ঘর প্রজাবিলিও ছিল। পিতার মৃত্যুর পর বিধুভূষণের যজমানগৃহ হইতে পাওনা ছিল—সর্ব্বশুদ্ধ মাসিক প্রায় ত্রিশ চল্লিশ টাকা আয়ের সংস্থান দাঁড়াইয়াছিল। ইহা ছাড়া পুষ্করিণীতে মাছ, ক্ষেতে ধান, ঘরে চারি পাঁচটা গরু ছিল—সংসার একপ্রকারে চলিয়া যাইত।

রাণী শ্বশুরবাড়ী আসিয়া সমস্ত গুছাইতে লাগিল। শাশুড়ীর গঞ্জনায় সে প্রথম প্রথম বড়ই কষ্ট বোধ করিত—কাজ করিতে গিয়া ভয়ে কিরূপ থতমত খাইত। একে সংসারের কাজ

করা কখন অভ্যাস নাই, তাহার উপর পদে পদে টিট্‌কারী—সে একটুতেই কাঁদিয়া ফেলিত। কিন্তু ক্রমে সকলই অভ্যস্ত হইয়া আসিল। ঐশ্বর্য্যপালিতা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা অল্পদিনের মধ্যেই গৃহস্থালীর সমস্ত কাজকর্ম্ম শিখিয়া লইল, এবং স্নেহ সেবা যত্নে সকলকে বশীভূত করিল। অমন যে শাশুড়ী, তাঁহাকেও এক-দিন বলিতে শুনা গিয়াছিল—"বিধু বেশ বউ এনেছে, বড় ঘরে এমন মেয়ে দেখা যায় না।"

রাণী নূতন সংসারের সহিত বনিবনাও করিয়া লইল, কিন্তু যে সংসারে তাহার জন্ম, সেই সংসারের নিকট যে নিরানন্দময় বিদায় লইয়া আসিয়াছে, তাহা তাহার মনে সদা-সর্ব্বদা জাগরূক রহিল। পিতার উপর তাহার রাগ নাই, বাধ্য হইয়া তাহাকে যে পিতার কষ্টের কারণ হইতে হইয়াছে, ইহাই তাহার অন্তরে শেলসম বিঁধিতে লাগিল। রাণী পিতাকে চিঠি লিখিল ;—

"বাবা, আমি তোমার নিকট অপরাধ করিয়াছি—ক্ষমা করিও। তুমি ইচ্ছাসুখে আমার হাতে যে ভার তুলিয়া দিয়াছ, সেই ভার বহিতে গিয়া তোমার মনে কষ্ট দিয়াছি, এইজন্য আমি বড় অসুখে আছি—তোমার পায়ে ধরিয়া আবার ক্ষমা চাহিতেছি। তুমি আমাকে বড় ভালবাস জানি,—তুমি আমাকে ক্ষমা করিলে না জানিলে আমি প্রাণে বাঁচিব না। শীঘ্র পত্রের উত্তর দিও। মাকে আমার প্রণাম জানাইও—তুমিও গ্রহণ করিও। তোমাদের কুশলসংবাদ চাই। ইতি। তোমার স্নেহের রাণী।"

কন্যাকে নির্দ্দয় ভৎর্সনা করিবার প হইতে বৃদ্ধ একেবারে নিতান্ত অবসন্ন মি হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিকার-রোগী .সরূপ মস্তিষ্কের তীব্র উত্তেজনায় কিয়ৎক্ষণ ভীষণ অঙ্গ আস্ফালন করিয়া আবার দ্বিগুণ অবসন্ন হইয়া পড়ে, বৃদ্ধের অবস্থাও সেইরূপ হইয়া-

ছিল। কন্যা চলিয়া যাইবার পর হইতে তাঁহার আহারে স্পৃহা ছিল না, কাজকর্ম্মে মন ছিল না—কেমন এক রকম হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার উপর গৃহিণী যখন জানিতে পারিলেন, কন্যা কিরূপ ভাবে বিদায় লইয়া গিয়াছে, তখন বৃদ্ধের লাঞ্ছনা গঞ্জনার আর সীমা রহিল না। এইরূপ অবস্থায় রাণীর চিঠি পাইয়া বৃদ্ধ শোকে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। উন্মত্ত যেরূপ আপনার ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে না—বৃদ্ধও সেইরূপ অশ্রুবিগলিতনয়নে বারবার চিঠিখানি পড়িলেন—ইচ্ছা হইল, চিঠির উত্তর দেন, কিন্তু উত্তর দিতে পারিলেন না।

এইরূপে সাত আট মাস কাটিয়া গেল। রাণী অন্তঃস্বত্বা ছিল—অসময়ে একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করিয়া অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িল। ক্রমশঃ অবস্থা খারাপ দাঁড়াইতে লাগিল। রাণী নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিল—

পিতামাতার সহিত বুঝি বা দেখা হইল না ভাবিয়া সে আরও কাতর হইয়া পড়িল। রোগশয্যা হইতে পিতাকে একখানি চিঠি দিল ;—

"বাবা, আমার একটি ছেলে হইয়াছে—সে ত তোমার কাছে কোন অপরাধ করে নাই, তাহাকে দেখিতে একবার তুমি এখানে এসো। আমি বড়ই পীড়িত, এ যাত্রা বুঝি আর বাঁচিব না। আর লিখিবার শক্তি নাই।"

চিঠি পাইয়া বৃদ্ধ একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "আজই জামাইবাড়ী যাব ; চিঠি দেখ, চিঠি দেখ,—আর বুঝি রাণীর সহিত দেখা হ'ল না!"—স্ত্রী ভূমিতলে আছাড় খাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। ভৃত্য কর্ম্মচারীরা আদেশ পাইয়া তাড়াতাড়ি সমস্ত গুছাইয়া ফেলিল। দুই বড় বড় বাক্সভরা

মহামূল্য গহনাপত্র সঙ্গে লইয়া বৃদ্ধ সস্ত্রীক যাত্রা করিলেন।

সন্ধ্যার পর সকলে জয়নগরে পৌঁছিলেন। ষ্টেশন হইতে বিধুভূষণের বাড়ী খুব নিকটে ছিল। বাড়ীতে পৌঁছিয়াই বৃদ্ধের জামাতার সহিত দেখা হইল—তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বৃদ্ধ গদগদস্বরে কহিলেন, "বাবাজী, কিছু মনে করিও না, বুড়ো মানুষের সব সময়ে মাথার ঠিক থাকে না—রাণু কোথায়? রাণু কোথায়? একটু ভাল আছে ত?" জামাতা শ্বশুর শাশুড়ীকে সঙ্গে লইয়া রাণীর ঘরে গেল। চৌকাট হইতে বৃদ্ধ দেখিলেন, রোগক্লিষ্টা শীর্ণকায়া কন্যা সন্তানকে পার্শ্বে লইয়া শয়ন করিয়া আছে। বৃদ্ধের ক্ষীণ দুটি চক্ষু বাষ্পে ভরিয়া গেল; ছুটিয়া গিয়া কন্যাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "মা, চেয়ে দেখ্ আমি এসেছি, মা, আমি এসেছি!"—কন্যা

কষ্টে উঠিয়া পিতামাতার পদধূলি গ্রহণ করিল, এবং পিতার দুই পা সবলে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "বাবা, বল, আমাকে ক্ষমা করিয়াছ!" বৃদ্ধ আস্তে আস্তে পা ছাড়াইয়া লইয়া কন্যার মস্তকে হাত রাখিয়া কহিলেন, "মা, আমার কিছু মনে নাই, কিছু মনে নাই,—সব ভুলে গেছি, সব ভুলে গেছি,—এখন তোকে আরাম হইতে দেখিলেই আমি বাঁচি!"—তৎপরে গহনাভরা বাক্স দুইটি আনিয়া কন্যার কাছে রাখিয়া কহিলেন, "মা, তুই রাগ ক'রে সব ফেলে এসেছিলি; এই নে, তোর জিনিস তোরই রহিল, আরাম হ'য়ে যখন এই গহনাগুলি পরবি, তখন আমার সব দুঃখ যাবে।" বাক্স হইতে একটি ছোট হার বাহির করি[illegible] নবকুমারের গলায় পরাইয়া দিয়া বৃদ্ধ ত[illegible]র মুখচুম্বন করিলেন। সে মুদ্রিতচক্ষে একটুখানি হাসিল। সে হাসিয়া যেন বলিল, "কেমন দাদা, এখন জারিজুরি কোথায় রহিল?"

তৎপরে বৃদ্ধ জামাতাকে বাহিরে আনিয়া কহিলেন, "তোমরা চলিয়া আসিলে আ[illegible] দানপত্র দ্বারা আমার বাড়ীখানা রাণীর না[illegible]মে লিখিয়া দিয়াছি, এবং বিষয়সম্পত্তি [illegible] তোমাদের উভয়ের নামে উইল করিয়া[illegible]" এই বলিয়া উইল ও দানপত্র বিধুভূ[illegible]ক দেখাইলেন,—"এক্ষণে তোমাদের বাটীতে তোমাদের থাকিতে কোনও লজ্জা নাই। রাণী ভাল হইলে তোমরা আসিয়া থাক, ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা।" বিধুভূষণ পূর্ব্বঘটনা স্মরণ করিয়া নিতান্ত লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইল, এবং একটিও কথা না কহিয়া বৃদ্ধ শ্বশুরের পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

পিতামাতাকে দেখিয়া এবং তাঁহাদের যত্নে রাণী শীঘ্র সারিয়া উঠিল। বৃদ্ধ যখন সকলকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন, তখন সেই শূন্য গৃহ আবার আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। স্নেহে

পরাজিত হইয়া বৃদ্ধের সুখের আর সীমা রহিল না।

রাজপুতানী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাজপুতানার একটি পার্ব্বত্যপ্রদেশে বীরনগর গ্রাম। ভীলসিংহ পূর্ব্বে সেনানী ছিলেন, এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়া অবসর প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার অঙ্গে কত যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন জননী জন্মভূমির জয়পতাকাস্বরূপ এখনও জাগিয়া রহিয়াছে। বৃদ্ধের সংসারে একমাত্র কন্যা পান্না ও বৃদ্ধা স্ত্রী।

বীরনগরে আজ মহাধূম—বীরাষ্টমী মেলা। রাজপুতানার সমগ্র রাজপুত সমাগত। এ বীরের মেলা,—এখানে শুধু পণ্যদ্রব্য বিক্রয় হইত না, সমাগত বীরমণ্ডলী এখানে তাঁহাদিগের বীরত্ব প্রদর্শন করিতেন। কেহ অসি-

যুদ্ধে, কেহ মল্লযুদ্ধে, কেহ বা ধনুর্বিদ্যায় স্বকীয় পরাক্রম ও রণকৌশল প্রদর্শন করিয়া গৌরব-মণ্ডিত হইতেন। পান্না এই মেলা দেখিতে আসিয়াছিল। মেলা ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই ঘোর ঝটিকা উত্থিত হইল। সমাগত জনসমূহ ছত্র-ভঙ্গ হইয়া পড়িল—সকলেই প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধ-শ্বাসে পলাইতে লাগিল।

পান্না কিন্তু এই দুর্য্যোগে ধীর পদক্ষেপে চলিতে লাগিল। সে বড় হতাশ হইয়া পড়িয়া-ছিল। পিতার নিকটে মল্লযুদ্ধ শিখিয়া তাহার বাহুতে যে বল ছিল, তার আজ একটু পরিচয় দিবে ভাবিয়াছিল—তাহার আর অবসর পাইল না। তাই প্রকৃতির উপর তাহার বড়ই রা হইল—ইচ্ছা করিতেছিল, প্রকৃতিকে দ্বন্দ আহ্বান করিয়া দুই নারীতে যুদ্ধ করে। যখন সকলে পলাইতে লাগিল—রাজপুতানার অসংখ্য বীরগণ পলাইতেছিল, তখন সেই রাজপুত বনকুসুম একবার হাসিল,—সে হাসি

বড়ই কঠোর, বড়ই কঠিন বিদ্রূপব্যঞ্জক,—সে হাসি হাসিয়া যেন উচ্চরবে বলিতে চাহিতেছিল, "রাজপুতকুলতিলক, ধিক্ তোমাদের বীরত্বে!"—চলিতে চলিতে পান্না আপনার উন্নত বিশাল বক্ষ ও সুডোল সুগোল সংহত-পেশী বাহুযুগলের প্রতি বিদ্যুতালোকে এক একবার তীব্র কটাক্ষপাত করিতেছিল।

হঠাৎ পান্না শুনিল কে যেন করুণস্বরে চীৎকার করিল, "আমি নিতান্ত অসহায় অন্ধ,—আমাকে রক্ষা কর!"—সেই স্বরে পান্না ব্যথিতের ন্যায় উর্দ্ধকণ্ঠে কহিল, "তুমি যেই হও নির্ভয়ে থাক, আমি তোমাকে রক্ষা করিব।" পান্নার সেই আশ্বাসবাণী গগন ভেদ করিয়া উঠিল। পান্না দেখিল, অদূরে এক সুশ্রী যুবাপুরুষ দণ্ডায়মান—তাহার মাথায় উষ্ণীষ ও পরিধানে বহুমূল্য পরিচ্ছদ। সে মূর্ত্তি দেখিয়া পান্নার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু তৎক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া বিপন্নের

নিকটবর্ত্তী হইয়া পান্না কহিল, "সঙ্কোচ করিবেন না, কি হইয়াছে আমাকে খুলিয়া বলুন—আমি প্রাণ দিয়া আপনার সাহায্য করিব।"

পথিক পান্নার আশ্বাসবাক্যে সাহস পাইয়া কহিল, "আমি অন্ধ, মেলায় আসিয়াছিলাম। ঝড়ে সঙ্গীরা কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—আমি অতি অসহায় হইয়া পড়িয়াছি।"

পান্না পথিকের হস্ত ধারণ করিয়া বলিল, "আপনি নির্ভয়ে আমার সঙ্গে আসুন।"

দৃষ্টিহীনেরা দেখিতে পায় না কিন্তু তাহাদিগের স্পর্শেন্দ্রিয় এত তীব্র যে, চারিচক্ষু-সম্মিলনে চক্ষুষ্মানের যত সুখ যত সম্ভোগ না হয়, হস্তস্পর্শে তাহারা ততোধিক অনুভব করে। পান্নার হস্তসংযোগে পথিকের শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিয়া গেল। পান্নারও হস্ত কাঁপিতেছিল—পথিক তাহা বুঝিতে পারিল। পান্না জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার পরিচয় কি জানিতে পারি?"

অন্ধ কহিল, "আমার পিতা অম্বর-দেশের একজন বিখ্যাত ধনী ও বীরপুরুষ। আমি তাঁহার একমাত্র সন্তান। পিতামাতা উভয়েই জীবিত আছেন। প্রায় দুই বৎসর হইল বসন্ত রোগে আমার দুই চক্ষুই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চক্ষু উন্মীলিত থাকিলেও উহা একেবারে দৃষ্টিহীন। কত চিকিৎসা করাইয়াছি—কিছুতেই কিছু হইল না। আমার নাম অমরকুমার।"

পান্নার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল,—কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিল, "আমাদের বাড়ীর নিকটে এক সন্ন্যাসী আছেন। তিনি অনেক ঔষধপত্র জানেন, অনেককে আরাম করিয়াছেন—তাঁহাকে দেখাইলে হয় ত ভাল করিয়া দিতে পারেন।—আচ্ছা, আপনি দেখিতে পান না, তবে মেলায় কি জন্য আসিয়াছিলেন?"

পথিক একটু হাসিয়া কহিল, "আমি চোখে দেখিতে পাই না সত্য, কিন্তু বীরসমাগমে উপ-

স্থিত থাকিতেও আমার সুখ—বীরেরা যখন দুন্দুভি নিনাদ করেন, তখন আমার মনে যি যে আনন্দ হয়, তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব।"

রণবাদ্যে রাজপুতবীরের শিরায় শিরায় বি বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটে তাহা পান্নার জানিতে আর বাকী ছিল না, তবু সে বিনয়নম্রস্বরে কহিল, "সামান্যা নারী আমরা তাহা কেমন করিয়া বুঝিব?"

পথিক কহিল, "এই ঘোর অন্ধকারে আপনি এমন্ ভাবে চলিতেছেন, নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে আপনার মাঠ পথ বিশেষ পরিচিত।"

"হাঁ, ঐ গ্রামের আলোক দেখা যাই-তেছে। আমরা অতি দরিদ্র। পিতামাতা বৃদ্ধ। এই সকল স্থান কষ্টে ভাঙ্গিয়া আসি বাজারে ছবি বিক্রয় করিয়া বৃদ্ধ জনকজননীর আহারের সংস্থান করি।"

এইরূপ নানা আলাপ পরিচয়ের মধ্যে পান্না নিজগৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া পৌছিল। গৃহ একটি

ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত—তাহাতে দুইটি মাত্র ঘর, ঠিক যেন পুরাকালের তাপস-দিগের আশ্রমের মত। তখন আকাশ অল্প অল্প পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। অন্ধকে গৃহপ্রাঙ্গণে বসাইয়া পান্না কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পদশব্দে পালিত হরিণ-শিশুটি নাচিতে নাচিতে আসিয়া তাহার অঙ্গে গা ঘষিতে লাগিল। পান্না তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া সস্নেহ মুখচুম্বনে বিদায়দান করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পান্না পিতার নিকটে অন্ধের আগমনবার্ত্তা জানাইল। ভীলসিংহ লাঠির উপর ভর দিয়া আস্তে আস্তে বাহিরে আসিয়া অতিথিকে অভিবাদনপূর্ব্বক ঘরের মধ্যে লইয়া গেলেন এবং পান্নাকে তাহার পরিচর্য্যার জন্য বলিয়া দিলেন। বৃদ্ধ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে অন্ধ

পান্নাকে যাহা যাহা বলিয়াছিল ঠিক তাহাই বলিল। শুনিয়া বৃদ্ধ ঈষৎ মুখ বিকৃত করিলেন এবং আস্তে আস্তে উঠিয়া পার্শ্বঘরে গিয়া স্ত্রীকে চুপিচুপি কি কহিলেন। বৃদ্ধা স্ত্রী কহিলেন, "বল কি ?"

অতিথির জন্য একটি ঘর নির্দ্দিষ্ট হইল। অন্ধের যদি চক্ষু থাকিত দেখিতে পাইতেন সেই গৃহের কি অভিনব সজ্জা,—যেন কোন্ চিত্রকরের শিল্পনৈপুণ্যে জীর্ণপট হইতে রুদ্র সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। অস্ত্রশস্ত্র গৃহসজ্জার প্রধান উপকরণ;—দেয়ালে কোথাও সমুজ্জ্বল তাম্রফলক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাণিত কিরীচের দ্বারা এমনি ভাবে বেষ্টিত যেন তারকামণ্ডিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে, কোথাও তীক্ষ্ণ শররাশি এমনি ভাবে সংরক্ষিত যেন শরবনের মত দেখাইতেছে, কোথাও গৃহ-কোণে শ্রেণীবদ্ধ বল্লমগুলি এমনি ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে যেন দেখিলেই মনে হয় যুদ্ধের

জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে,—মধ্যে মধ্যে পান্নার স্বহস্তচিত্রিত রণক্ষেত্রের ছবি। বৃদ্ধ পিতার যৌবনের গৌরবময় স্মৃতিচিহ্নগুলিকে পান্না কত না যত্নে সাজাইয়া রাখিয়াছে। অতিথিসৎকারের কোন ত্রুটি হইল না—পান্না স্বহস্তে অন্ধকে খাওয়াইল। আহারাদির পর বীণা লইয়া পান্না যখন জাতীয় সঙ্গীত আরম্ভ করিল, তখন অন্ধ আর থাকিতে পারিল না—আবেগভরে বলিয়া উঠিল, "যাহার হৃদয় এত মহৎ, যাহার স্বর এত মধুর, সে না জানি কত সুন্দর!"—পান্না একটুখানি বিষণ্ণ হাসি হাসিল।

পরদিন প্রাতে পান্না অন্ধকে লইয়া সন্ন্যাসীর নিকটে গমন করিল। সন্ন্যাসী দুই চক্ষু ভাল করিয়া দেখিয়া কহিলেন, "আরাম হইবে। এই শিকড়টি লইয়া যাও—প্রত্যহ দুইবার করিয়া ইহার প্রলেপ দিবে। সূর্য্যালোক চক্ষে একেবারে লাগিতে দিবে না।" সন্ন্যাসী

আহারাদি ও অন্যান্য বিষয়েও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পান্না প্রাণপণে অন্ধের সেবা করিতে লাগিল। পিতামাতা লক্ষ্য করিলেন পান্না দিন দিন যেন শীর্ণ বিষণ্ণ হইয়া পড়িতেছে।

ক্রমে অন্ধ একটু একটু দেখিতে পাইল। পান্নার প্রাণে আশার সঞ্চার হইল।

হঠাৎ একদিন অন্ধের চোখ খুলিয়া গেল,— ভূমিষ্ঠ হইয়া শিশু যেমন নূতন আলোক দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠে—নূতন দৃষ্টিলাভ করিয়া পান্নাকে দেখিয়া অমরকুমারও তেম্‌নি চীৎকার করিয়া উঠিল, কহিল, "পান্না, তুমি!"

পান্না কোন কথা না কহিয়া ঘা ‌ ‌ হেঁট করিয়া রহিল।

অমরকুমার পুনরায় কহিল, "তুমি ‌ বিবাহ হয় নাই?"

"না।—আপনার?"

"আমিও বিবাহ করি নাই, কিন্তু—"।

"কিন্তু বলিয়া থামিলেন যে?"

"কিন্তু আজ যদি তোমাকে পাই, বিবাহ করিয়া জীবন সার্থক করি। তোমার দয়া আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না।—"

পান্না উঠিয়া দাঁড়াইল,—তাহার দেহযষ্টি সবেগে কাঁপিতে লাগিল। রুদ্ধ স্রোত বাহির হইবার পথ পাইয়া দুর্দ্দমনীয় বেগে যেরূপ বহিতে থাকে, পান্নারও অবস্থা সেইরূপ হইল —সে মনের আবেগ কোনমতেই থামাইতে পারিল না, কম্পিতকণ্ঠে কহিতে লাগিল, "আজ আপনি আমার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিতেছেন, কিন্তু রাজপুতানী কৃতজ্ঞতার জন্য কখনও বিবাহ করে না। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা একবার স্মরণ করুন। আমার সেই যৌবনের প্রথম আরম্ভ সুখের সময়ে কত প্রেম কত না আশা জাগাইয়া আমার হৃদয় মন কাড়িয়া লইয়া আপনি বিনা অপরাধে আমাকে কিরূপ-ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, একবার স্মরণ

করুন! পিতার হঠাৎ দুরবস্থা দেখিয়া শত্রুপক্ষ আমার নামে কলঙ্ক রটাইল—আপনার পিতা এবং অবশেষে আপনিও তাহা বিশ্বাস করিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিলেন,—একবারও ভাবিলেন না, আমার, আমার পিতামাতার কি দশা হইবে! যে দিন বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেল সেইদিন হইতেই পিতামাতা দশগুণ বুড়া হইয়া পড়িয়াছেন। তখনই আমার মৃত্যু ভাল ছিল, —আমি মরিতাম,—রাজপুতানী মরিতে জানে, —কেবলমাত্র বৃদ্ধ পিতামাতার মুখের দিকে চাহিয়া বাঁচিয়া রহিলাম। আপনি যদিও আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু আমি আপনাকে ভুলি নাই।"—এই বলিয়া পান্না কটিদেশ হইতে একটি ক্ষুদ্র ছুরিকা বাহির করিল—হস্তিদন্তনির্ম্মিত সেই ছুরিকার অগ্রভাগে পান্নার স্বহস্তচিত্রিত অমরকুমারের ছবি ও তাঁহার নাম লেখা।

অমরকুমার ক্ষিপ্তের ন্যায় লাফাইয়া উঠিল—

দুই হাত যুক্ত করিয়া কহিল, "পান্না! পান্না! ক্ষমা কর, ক্ষমা কর! তখন তোমাকে চিনি নাই, চিনি নাই! এখন আমার চোখ ফুটিয়াছে,—বিবাহে সম্মত হও, নহিলে আমি বাঁচিব না!"

পান্নার তবুও সেই এক কথা—"রাজপুতানী কৃতজ্ঞতার জন্য কখনও বিবাহ করে না।"

অমরকুমার আরও দুই চারি দিন রহিল। ক্রমে বিদায়ের কাল উপস্থিত হইল। পান্নার জনকজননীর নিকট কৃতজ্ঞতার সহিত বিদায় লইয়া অমরকুমার যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। পান্না বীরাঙ্গনাবেশে আপনাকে সজ্জিত করিয়া সেই প্রথম মিলনস্থান মেলা অবধি রাখিতে অমরকুমারের সঙ্গে চলিল।

জনহীন শূন্য প্রান্তর। পাখীরা কলকণ্ঠে ভোরে সানাই বাজাইতেছে। মিলিত অথচ বিচ্ছেদকাতর দুই জনে নিঃশব্দে চলিয়াছে—কাহারও মুখে একটিও কথা নাই,—মিলন-

সুধাসাগরের তীরে আসিয়া শূন্যকক্ষে আবার ফিরিতে হইবে!—হায়!

ক্রীড়াভূমির নিকটবর্ত্তী হইয়া পান্না থামিল। অমরকুমার কাতরদৃষ্টিতে পান্নার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "পান্না, তবে চলি—ঈশ্বর যদি দিন দেন তবে আবার দেখা হইবে মনে রাখিও।"

সেই মিলন-বিচ্ছেদের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া পান্না যতক্ষণ পারিল অমরকুমারকে চাহিয়া দেখিল। ফিরিবার সময় সেই রাজপুত ব[illegible] কুসুমের গণ্ড বাহিয়া দুই ফোঁটা শিশিরা[illegible] ঝরিয়া পড়িল।

পরিণাম।

সকলেই জানেন, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় কাণপুরে অনেক ইংরাজকে বিদ্রোহীর হস্তে প্রাণ দিতে হয়।

এই সময়ে একদিন মনিয়ার নামে জনৈক ইংরাজ কর্ম্মচারী, স্ত্রী ও এক বৎসরের একটি শিশুকন্যাকে সঙ্গে লইয়া ডাকগাড়ী করিয়া স্থানান্তরে গমন করিতেছিলেন। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে সাহেব দেখিলেন, একদল সশস্ত্র সিপাহী বিকট চীৎকার করিতে করিতে তীরবেগে গাড়ীর দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। সাহেব স্ত্রীকে গাড়ীর পশ্চাৎদিকের দরজা দিয়া তাড়াতাড়ি নামাইয়া দিয়া কহিলেন, "তুমি শীঘ্র মেয়েকে লইয়া দৌড়াইয়া নিকটস্থ কাহারও বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লও, আমি ততক্ষণ

উহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া ঠেকাইয়া রাখিতেছি।" এই বলিয়া সাহেব সশস্ত্র রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিতে দেখিতে উন্মত্ত বিদ্রোহিদল আসিয়া উপস্থিত হইল। সাহেব একা আর বেশীক্ষণ যুঝিতে পারিলেন না, অবিলম্বে ভূতলশায়ী হইলেন।

মিসেস্ মনিয়ার দৌড়াইয়া এক মুসলমান বণিকের বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন। বণিক প্রথমে কোনমতেই আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হইলেন না; অবশেষে স্বামীর মৃত্যু হইলে তাহাকে বিবাহ করিবে, এই শপথ করাইয়া লইয়া মেমকে বাড়ীতে স্থান দিলেন। মুসলমান অনেকদিন যাবৎ মেমকে অন্দরে লুকাইয়া রাখিলেন। কিন্তু স্বামিশোকেই হউক, কিম্বা মুসলমানের অনুগৃহীতা হইয়া থাকিতে হইবে এই দারুণ মনস্তাপেই হউক, মিসেস্ মনিয়ার ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া শীঘ্রই ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। অন্ধকার রাত্রে গোপনে

খাঁসাহেব বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগের বাগানে মেমের কবর দিলেন।

ছোট মেয়েটিকে লইয়া কিন্তু খাঁসাহেব ভারি বিপদে পড়িলেন। খাঁসাহেব নিজে দেখিতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ;—মেয়েটির নীল চোখ, কটা চুল, ধব্‌ধবে শাদা রঙ্‌ দেখিয়া সকলেই নিশ্চয় সন্দেহ করিবে যে, এ সাহেবের মেয়ে,—হয় ত মনিয়ারের হত্যাপরাধে শেষে তাঁহাকে অভিযুক্ত হইতে হইবে। মেয়েটির জন্য পূর্ব্বেই একটি বৃদ্ধা আয়া নিযুক্ত হইয়াছিল। খাঁসাহেব ভয়ে ভয়ে মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া আয়াকে সঙ্গে লইয়া গোপনে কলিকাতায় আসিলেন। কলিকাতায় আসিয়া খিদির-পুরের কাছে ছোটখাট একটি একতালা বাড়ী ভাড়া লইয়া আয়ার সঙ্গে মেয়েটিকে রাখি-লেন। সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্‌ করিয়া খাঁসাহেব পুনরায় কাণপুরে ফিরিয়া আসিলেন, এবং মেয়ের জন্য আয়ার নামে মাসে মাসে, বিশ

ত্রিশ, যখন যেমন সুবিধা হইত, টাকা পাঠা-ইতে লাগিলেন।

মেয়েটি একটু বড় হইয়া কথা কহিতে শিখিয়া বুড়ীকে "আয়ি" বলিয়া ডাকিত। বুড়ী মেয়েকে আদর করিয়া "মণিবাবা" বলিত।

মেয়েটি বড় হইতে লাগিল, এবং দেখিতে দেখিতে অলক্ষ্যে তরুশাখার ন্যায় বুড়ীর শুষ্ক বক্ষঃপঞ্জরের মধ্যে এমন্ একটি ক্ষুদ্র স্নেহনীড় রচনা করিল, যাহার জন্য, এই জরাজীর্ণ দেহ লইয়া যে পূর্ব্বে প্রতিনিয়ত মৃত্যুকামনা করিত, সে এক্ষণে মনে মনে দেবতার নিকট প্রার্থনা করিল, "আরও কিছুদিন আমাকে রাখো - মেয়েটিকে মানুষ করিয়া বড় করিয়া [illegible]র একটা সদ্গতি দেখিয়া তবে যেন মরিতে পারি।"

বুড়ী এক্লাই সব কাজ করিত। খুব ভোর থাকিতে উঠিয়া লাঠি-হাতে ঠুক্ঠুক্

করিয়া নিজে গয়লাবাড়ী গিয়া দুধ লইয়া আসিত, পাছে গয়লা দুধে জল মেশায়;— নিজে বাজার করিত, রাঁধিত, স্নান করাইত, খাওয়াইত, স্কুলে রাখিয়া আসিত, মধ্যাহ্নে পুনরায় স্কুলে গিয়া খাওয়াইয়া আসিত, অপরাহ্নে আবার স্কুল হইতে মেয়েটিকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী আনিত। মেয়েটি যখন স্কুলে থাকিত, তখন অন্য কোন ক। র্ম্ম না থাকিলে বুড়ী দৃষ্টিহীন চক্ষে সুতাবাঁধা একটি চস্‌মা আঁটিয়া মেয়ের জন্য কাপড় শেলাই করিতে বসিত। রাত্রে মেয়েটিকে বুকের কাছে রাখিয়া বুড়ী সেকালের কত অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলিত,—বলিতে বলিতে সেই রক্ষকবিহীন নির্জ্জন গৃহে নিরাশ্রয় দুইজনে ঘুমাইয়া পড়িত। এইরূপে দিনরাত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া বুড়ী মেয়েটিকে মানুষ করিয়া তুলিতে লাগিল। কাঁচা কাঠ শীঘ্র ধরে না, শুষ্ক কাষ্ঠেই ইন্ধন প্রস্তুত হয়। বুড়া হাড়ে এক-

ত্রিশ, যখন যেমন সুবিধা হইত, টাকা পাঠাইতে লাগিলেন।

মেয়েটি একটু বড় হইয়া কথা কহিতে শিখিয়া বুড়ীকে "আয়ি" বলিয়া ডাকিত। বুড়ী মেয়েকে আদর করিয়া "মণিবাবা" বলিত।

মেয়েটি বড় হইতে লাগিল, এবং দেখিতে দেখিতে অলক্ষ্যে তরুশাখার ন্যায় বুড়ীর শুষ্ক বক্ষঃপঞ্জরের মধ্যে এমন্ একটি ক্ষুদ্র স্নেহনীড় রচনা করিল, যাহার জন্য, এই জরাজীর্ণ দেহ লইয়া যে পূর্ব্বে প্রতিনিয়ত মৃত্যুকামনা করিত, সে এক্ষণে মনে মনে দেবতার নিকট প্রার্থনা করিল, "আরও কিছুদিন আমাকে রাখো—মেয়েটিকে মানুষ করিয়া বড় করিয়া ইহার একটা সদ্গতি দেখিয়া তবে যেন মরিতে পারি।"

বুড়ী এক্লাই সব কাজ করিত। খুব ভোর থাকিতে উঠিয়া লাঠি-হাতে ঠুক্ঠুক্

করিয়া নিজে গয়লাবাড়ী গিয়া দুধ লইয়া আসিত, পাছে গয়লা দুধে জল মেশায়;—নিজে বাজার করিত, রাঁধিত, স্নান করাইত, খাওয়াইত, স্কুলে রাখিয়া আসিত, মধ্যাহ্নে পুনরায় স্কুলে গিয়া খাওয়াইয়া আসিত, অপরাহ্নে আবার স্কুল হইতে মেয়েটিকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী আনিত। মেয়েটি যখন স্কুলে থাকিত, তখন অন্য কোন কাজকর্ম্ম না থাকিলে বুড়ী দৃষ্টিহীন চক্ষে স্থতাবাঁধা একটি চস্মা আঁটিয়া মেয়ের জন্য কাপড় শেলাই করিতে বসিত। রাত্রে মেয়েটিকে বুকের কাছে রাখিয়া বুড়ী সেকালের কত অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলিত,—বলিতে বলিতে সেই রক্ষকবিহীন নির্জ্জন গৃহে নিরাশ্রয় দুইজনে ঘুমাইয়া পড়িত। এইরূপে দিনরাত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া বুড়ী মেয়েটিকে মানুষ করিয়া তুলিতে লাগিল। কাঁচা কাঠ শীঘ্র ধরে না, শুষ্ক কাষ্ঠেই ইন্ধন প্রস্তুত হয়। বুড়া হাড়ে এক-

বার স্নেহের আঁচ লাগিলে ধুধু করিয়া জ্বলিতে থাকে।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, খাঁসাহেব মধ্যে একবার আসিয়া মেয়েটিকে এক অর্ফান স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া যান। সেখানে নাম ভাঁড়াইয়া "মিস্ টার্নার" বলিয়া মেয়েটির পরিচয় দেন, এবং নিজেও ঐ নামে তাহাকে ডাকিতে থাকেন।

স্কুলে অল্পদিনের মধ্যেই ছাত্রী হইতে শিক্ষয়িত্রী পর্য্যন্ত সকলেই মেয়েটির গুণে মুগ্ধ হইল। তাহার দীনতা, বিনয় সৌজন্য দেখিয়া সকলেই তাহাকে ভালবাসিল, সকলেই তাহার বন্ধু হইল।

প্রতিবাসীরা ও যে সকল সাহেব মেম বাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী রাস্তা দিয়া যাতায়াত করিত, তাহারা প্রায়ই মেয়েটি সম্বন্ধে বুড়ীকে অনেক প্রশ্ন করিত,—কাহার মেয়ে, বাপ মা কোথায়, এখানে থাকে কেন, ইত্যাদি। মেয়েটি

অনাথা নিরাশ্রয় জানিলে পাছে তাহার বিপদ্-সম্ভাবনা হয়, এই ভয়ে বুড়ী মিথ্যা করিয়া বলিত,—"টার্ণার সাহেবের মেয়ে, সাহেব পশ্চিমে কাজ করেন, কখন্ কোথায় থাকেন ঠিক নাই,—মেয়ের মা নাই, তাই আমার কাছে এইখানে রাখিয়া গেছেন।"

বুড়ী ভয়ে স্কুল ছাড়া মেয়েকে বাড়ীর বড় একটা বাহির করিত না—মেয়েটিও বাহিরে যাইতে চাহিত না। মেয়েটির আমোদের জন্য বুড়ী নিজের পয়সা খরচ করিয়া এক রাশ হাঁস, পায়রা ও গোটাকতক শাদা ইঁদুর কিনিয়া দিয়াছিল—সে বাড়ীতে তাহাদের লইয়াই খেলা করিত।

সন্ধ্যার সময় দুইজনে সিঁড়ির ধাপে আসিয়া বসিত; ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা উড়িয়া আসিয়া বালিকাকে একেবারে ঘিরিয়া ফেলিত—বালিকা তাহাদের জন্য মটর ছড়াইয়া দিত,—শাদা ইঁদুরগুলাকে কোলের উপর রাখিয়া

রুটীর টুক্‌রা খাওয়াইত। এইরূপে বৎসরের পর বৎসর কাটিতে লাগিল। বালিকাও ক্রমে ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিল।

একদিন দুইজনে সিঁড়িতে বসিয়া আছে, এ কথা সে কথার পর বালিকা বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আয়ি, আমার মা বাপের কথা তুমি কি কিছু জান?"

আয়ি কহিল, "সে কথা কেন জিজ্ঞাসা কর, মণিবাবা,—তাঁহারা ত কেহই নাই।"—এই বলিয়া চোখের জল মুছিল।

বালিকা কহিল, "আচ্ছা, খাঁসাহেব আমার কে হন? উনি এখানে আসেন কেন, আমার জন্য টাকাই বা কেন পাঠান?"

বুড়ী কহিল, "উনি তোমার মা বাপের খুব বন্ধু ছিলেন, তাই তোমাকে এত স্নেহ করেন।"

বালিকা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "আয়ি, আর কতদিন এইরূপ থাকিব?"

বুড়ী কহিল, "কেন মণিবাবা, এমন কথা বলিতেছ, তোমার দুঃখ কি ?"

এই সময়ে বিচিত্রবাসপরিহিত এক দল সাহেব মেম হাস্যকলরব তুলিয়া, সুগন্ধ ছড়াইয়া বাড়ীর সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল।

তাহারা চলিয়া গেল, কিন্তু ঢেউ আসিয়া বালিকার হৃদয়ে আঘাত করিল ; তাহার দৈন্য আরও ফুটিয়া উঠিল—চোখ ছল্‌ছল্‌ করিতে লাগিল।

বুড়ী তাহা দেখিতে পাইল না, কিন্তু মণিবাবাকে অনেকক্ষণ চুপ্‌ করিয়া থাকিতে দেখিয়া, সে তাহার মনের দুঃখ বুঝিল, কহিল, "চল বাবা, আজ হাঁসদের খাওয়ান হয় নাই, তাহাদের খাওয়াইয়া আসি।"

২

খাঁসাহেব প্রায় দুই বৎসর পরে কলিকাতায় আসিয়াছেন। অনেক মাল নৌকাডুবি হইয়া কারবার ফেল হওয়ায় তিনি এক্ষণে ঋণগ্রস্ত।

হঠাৎ এই বিপৎপাতে খাঁসাহেবের মেজাজ একেবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে। যে কসাই রোজ বাড়ীতে মাংস দিয়া যায়, মাংস খারাপ হওয়াতে একদিন তাহাকে এমন্ গালি দিলেন যে, আর একটু হইলেই খুনাখুনি ব্যাপার হইত ;—গয়লার হিসাব লইয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হইলেন ; সে দুধ দেওয়া করিল। কারণে অকারণে প্রতিবাসী সকলে সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করিলেন। বুড়ীও বড় একটা বাদ যাইত না ; কিন্তু সে মেয়ের মুখ চাহিয়া সকলই সহ্য করিত।

একদিন খাঁসাহেবের কিছু টাকার আবশ্যক হইল, বুড়ীর কাছে চাহিলেন। বুড়ী কহিল "সাহেব, আপনি যে টাকা পাঠাইতেন তাহাতে বাড়ী ভাড়া দিয়া খুব কষ্টেই সংসার চলিয়াছে। আমার যা' কিছু টাকা সঞ্চিত ছিল, তাহাও মেয়েটির জন্য খরচ করিয়াছি— আমার হাতে কিছুই নাই।"

বুড়ীর কথায় খাঁসাহেব একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন, দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন, "যাহা পাঠাইতাম, তাহা হইতে অন্ততঃ দু' শ' টাকা এতদিনে খুব রাখা যাইত। এত টাকা পাঠাই-তাম, সবই খরচ হইয়াছে!—নিশ্চয়ই তুই চুরি করিয়াছিস্—তোকে পুলিসের হাতে দিব।"

বুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "শেষে এই কথা! আপনার যা' ইচ্ছা হয় করুন, খোদাকি কসম্, আমি আপনার টাকা লই নাই!"

খাঁসাহেব কহিলেন, "তুই আমার বাড়ী থেকে এখনি বেরো।"

বালিকা বুড়ীর হইয়া অনেক বলিল, কাঁদিতে কাঁদিতে হাতে পায়ে ধরিল, কিছুতেই কিছু হইল না। বুড়ী বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত হইল। যাইবার সময় বালিকার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "যদি বাঁচিয়া থাকি, আর আল্লা দিন দেন ত আবার দেখা হইবে।" বালিকাও খুব কাঁদিল।

বুড়ী কয়েক দিন লুকাইয়া "মণিবাবা"র সহিত দেখা করিল, কিন্তু একদিন ধরা পড়িয়া খাঁসাহেবের নিকট এমন্ ভর্ৎসিত হইল যে, সেই অবধি আর তাহাকে দেখা গেল না।

খাঁসাহেবের এক পরম বন্ধু সীলোনে চালের ব্যবসা করিতেন। খাঁসাহেব পত্র দ্বারা তাঁহাকে আপনার অবস্থা জানাইলেন। উত্তরে বন্ধুবর তাঁহাকে সীলোনে আসিতে লিখিলেন, এবং পথখরচাও পাঠাইলেন। খাঁসাহেব মেয়েটিকে অর্ফানেজে বোর্ডার রাখিয়া সীলোন যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য, অর্ফানেজ্ অনাথ বালকবালিকার জন্য—সেখানে কোনও খরচ দিতে হয় না।

৩

বালিকা এখন পূর্ণবয়স্কা যুবতী, সুতরাং, এখন হইতে আমরা তাহাকে মিস্ টার্নার বলিয়াই ডাকিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অর্ফানেজের সকলেই

মিস্ টার্নারকে খুব ভালবাসিত। সেখানে এক মিশনারী মেম প্রতি শনিবারে আসিয়া মেয়েদের বাইবেল শিক্ষা দিতেন। মিস্ টার্নারের প্রতি তাঁহার ভালবাসার আর সীমা ছিল না। মিস্ টার্নার ক্রমে এণ্ট্রেন্স, এফ্, এ, পাস করিল। তখন ঐ মিশনরী মেম এক-দিন তাহাকে বলিলেন, "তুমি যদি আমাদের মিশনে কাজ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া দিতে পারি।" মিস্ টার্নার খুব আনন্দের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

অল্পদিন পরেই মিস্ টার্নার মিশনে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার মাসে এক শত টাকা বেতন ধার্য্য হইল। তিনি বৌবাজারের কাছে একটি ছোটখাট বাড়ী ভাড়া লইয়া মিশনের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল। বুড়ীকে কিন্তু মিস্ টার্নার ভুলিতে পারিলেন না,

তাহার জন্য মনটা মাঝে মাঝে কেমন করিত। গ্রহণের সময় যেমন পৃথিবীর উপর ম্লান আভা পড়িয়া সমস্তই মলিন দেখায়, স্বাধীন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও মিস্ টার্নারের মনে তেমনই বুড়ীর জন্য দুঃখের একটা ম্লান ছায়া চিরদিনের জন্য রহিয়া গেল।

একদিন মিস্ টার্নার ঘরে বসিয়া লিখিতেছেন, এমন্ সময় তিন চারি জন পুলিসের লোক সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া একটা বাক্স হইতে কতকগুলি অলঙ্কার ও একটা পুঁটুলিতে বাঁধা দুই শত টাকার নোট্ দেখাইয়া কহিল, "এই অলঙ্কার, এই নোট্ আপনার কি?"

মিস্ টার্নার অলঙ্কারগুলি অনেকক্ষণ নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া কহিলেন, "এ অলঙ্কারও আমার নয়, এ নোটও আমার নয়।" পুলিস আর কোনও কথা না বলিয়া অলঙ্কারগুলি বাক্সয় ভরিয়া ও নোটগুলি বাঁধিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে মিস্‌ টার্নার রাস্তা হইতে একটি মর্ম্মভেদী আর্ত্তস্বর শুনিতে পাইলেন। ছুটিয়া রাস্তায় গিয়া দেখেন, পুলিসের প্রহারে এক বুড়ী অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে—পার্শ্বে সেই পুলিসের লোক দাঁড়াইয়া। মেম "আয়ি"কে চিনিতে পারিলেন—তীব্র চীৎকার করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার পর পুলিসের লোকদের নীচের ঘরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বুড়ীকে কোলে করিয়া উপরে লইয়া গেলেন।

অনেক কষ্টে বুড়ীর চৈতন্য হইল। একটু সুস্থ হইলে মেম ডাকিলেন, "আয়ি!"

বুড়ী ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল, "মণিবাবা!"

মেম কহিলেন, "এ কি ব্যাপার আয়ি?"

বুড়ী থামিয়া থামিয়া কহিতে লাগিল, "আমার আর সময় নাই। আমি যাহা বলি শোন। তোমার মা খাঁসাহেবের ভয়ে লুকাইয়া আমার কাছে কতকগুলি গহনা রাখিয়াছিলেন,

বলিয়া দিয়াছিলেন, তুমি বড় হইলে সেগুলি তোমাকে দিতে। দেশে বাড়ীতে আমার নাতির কাছে গহনাগুলি রাখিয়া দিয়াছিলাম। দেশ হইতে এই গহনার বাক্স আনিয়া পথে পথে কতদিন যে তোমার সন্ধানে ফিরিয়াছি, তাহার ঠিক নাই।—উঃ!—তাহার পর আজ দুই দিন হইল পুলিসের হাতে পড়ি। তোমার নাম ভুলিয়া গিয়াছিলাম,—'মণিবাবা' বলাতে উহারা কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার পর তুমি একসময়ে খিদিরপুরের যে স্কুলে পড়িতে, তাহার নাম করাতে পুলিস আমাকে সেখানে লইয়া গেল। সেখানে সকলেই আমাকে চিনিল, —তোমার নাম ও সন্ধান পুলিসকে বলিয়া দিল।—উঃ!—আর মণিবাবা, খাঁসাহেব দু' শ' টাকার দাবী দিয়া আমায় যে চোর অপবাদ দিয়াছিলেন—আমি দেশের জায়গা-জমী বিক্রি করিয়া সেই টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি—দুই-ই পুলিসের কাছে আছে।

খাঁসাহেবকে টাকা দিও, আর গহনাগুলি তুমি পরিও।—উঃ!—" বুড়ীর চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল,—তাহার পর কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া আবার কহিল, "তুমি সুখে আছ ত?"

মেম বুড়ীকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "তোমাকে দেখিতে পাইলাম আয়ি, এই আমার সুখ, তোমাকে যে কত খুঁজিয়াছি!"

বুড়ী অস্পষ্ট উচ্চারণে কহিল, "আমার ত দিন ফুরাইয়াছে, খোদা তোমাকে সুখে রাখুন। মণিবাবা, গয়নার বাক্স আন—আমি নিজের হাতে তোমাকে পরাইয়া দিই।"

মেম পুলিসের কাছে গিয়া বলিলেন, "আমার ভুল হইয়াছিল, এই গহনার বাক্স ও নোট্ আমারই।" মেম বলিতেছেন, পুলিস অগত্যা রসিদ লইয়া ছাড়িয়া দিল।

বুড়ী কম্পিতহস্তে একজোড়া সোনার বালা লইয়া মেমের হাতে পরাইয়া দিতে লাগিল।—একহাতে পরাইয়া আর পারিল না, সর্ব্বাঙ্গ

কাঁপিতে লাগিল। বুড়ী আর একবার ক্ষীণ-কণ্ঠে ডাকিল, "মণি—," তাহার পর সব শেষ হইল।

মেমের কান্না রাস্তা হইতে শোনা গেল। প্রকৃতিস্থ হইয়া মেম সমারোহের সহিত বুড়ীকে কবর দিলেন। প্রত্যেক রবিবারে সন্ধ্যার সময় দেখা যাইত, "আয়ি"র কবরের উপর ফুল রাখিয়া মিস্ টার্নার বসিয়া আছে।

পিতা ও পুত্র।

১

রমাকান্তের অনেক গুণ ছিল, দোষের মধ্যে সে অত্যন্ত বদ্‌রাগী,—যখন রাগিত দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকিত না। কিন্তু এই রাগটা ঘরের মধ্যে যতটা প্রবলরূপে প্রকাশ পাইত, ঘরের বাহিরে ততটা নয়। এই কারণে, রমাকান্তের বন্ধুবান্ধবের সংখ্যার অবধি ছিল না, সমাজেও প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল, কেবল ঘরের মধ্যে তেমন্ প্রতিষ্ঠা ছিল না।

রমাকান্তের পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি ছিল, তদুপরি নানান্ রকমের কারবারেও যথেষ্ট আয় ছিল—সংসার সুখে-স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। সংসারে থাকিবার মধ্যে রমাকান্ত নিজে, বুড়ি মা, আট বৎসরের একটি ছেলে ও

বিধবা এক ভগ্নী। রমাকান্তের স্ত্রী ছেলেটিকে পাঁচ বৎসরের রাখিয়া ভবলীলা সম্বরণ করেন।

রমাকান্ত ছেলেটিকে অতিশয় ভালবাসিত, কিন্তু বাহিরে ব্যবহারে সে ভালবাসা প্রকাশ পাইত না, বরং অনেক সময়ে তাহা রূঢ়তারই আকার ধারণ করিত। ছেলেকে মানুষ করিয়া তুলিতে চিত্তের যে সরসতা, যে সহিষ্ণুতা আবশ্যক, রমাকান্তের তাহা আদবেই ছিল না, অথচ অন্যের যত্নচেষ্টাও তাহার কখনও মনঃপূত হইত না ;—এই কারণে, ছেলেকে লইয়া রমাকান্তের প্রায়ই মা'র সঙ্গে খিটিমিটি বাধিত, যত ঝাল্ বেচারা মা'র উপরেই আসিয়া পড়িত। ছেলের অসুখ করিল, সে দোষ মায়ের। মা বলিতেন, "বাছা, আমি কি আর সাধ করে' অসুখ ডেকে এনেছি, অসুখ করেছে আবার সেরে যাবে,"—মাষ্টারের কাছে ছেলে পড়া পারিল না—সে দোষ মায়ের, মা তাহাকে আদর দিয়া খারাপ

করিতেছেন। যে দিন নিতান্ত থাকিতে পারিতেন না, মা রাগ করিয়া বলিতেন, "রমা, আমাকে আর জ্বালাস্‌নে,—তোর ভয়ে আজ-পর্য্যন্তও ওকে একটা ভাল জিনিষ হাতে করে' তুলে দিতে পারলুম্ না, তবুও বলিস্ কি না আমি আদর দিয়ে খারাপ কর্‌চি,—আজ যদি ওর মা থাক্‌ত"—বলিতে বলিতে চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িত। এইরূপ সামান্য কারণে, সামান্য এদিক্ ওদিকে রমাকান্ত প্রায়ই বাড়ি মাথায় করিয়া তুলিত। রমাকান্ত যে সব সময়ে ইচ্ছা করিয়া এরূপ করিত তাহা নহে, সে সবই বুঝিত, কিন্তু নিজেকে সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারিত না। ইহাকে স্নায়ুর দোষই বল, আর স্বভাবের দোষই বল,—রমাকান্তের ইহা মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মাঝ হইতে ছেলের পড়াশুনা কিছুই হইতেছিল না। আশ্রয়হীন পথের বালকের ন্যায় সে সমস্ত দিন এ-ঘর ও-ঘর করিয়া

বেড়াইত। রমাকান্ত যে ইহা বুঝিতেন না তাহা নহে, কিন্তু প্রতিকারের অন্য কোন ভাল উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া কেবল মাষ্টারের উপর মাষ্টারই বদ্‌লাইতে লাগিলেন,—অবশেষে কিছুতে না পারিয়া একশত টাকা বেতনে গবর্ণমেণ্টের এক পেন্সন্‌প্রাপ্ত হেড্‌-মাষ্টারকে ছেলের গার্ডিয়ান্ টিউটার স্বরূপ ঠিক করিয়া বাড়িতে রাখিয়া দিলেন।

লোকটি অতিশয় প্রবীণ, অতিরিক্ত বিবেচক ও বুদ্ধিমান এবং কঠোর নীতি-পরায়ণ। নিক্তির ওজনে তিনি সব কাজ করিতেন—একটু এদিক্ ওদিক্ হইবার যো ছিল না। স্কুলে থাকিতে ছেলেরা "বাঘা হেড্‌মাষ্টার" তাঁহার নাম দিয়াছিল—ইহা হইতেই তাঁহার শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে সকলেই অবধারণ করিতে পারিবেন—অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন।

মাষ্টার মহাশয় প্রায়ই ছেলের নামে বাপের

কাছে আসিয়া নালিশ করিতেন, রমাকান্তও ছেলেকে ধমক্‌ধামক্ দিতেন। এইরূপে দিন যায়; একদিন মাষ্টার মহাশয় অগ্নিশর্ম্মা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে রমাকান্তের কাছে আসিয়া বলিলেন, "আমি চলিলাম, আমি আর পড়াইতে পারিব না।" "কেন, কি হইয়াছে ?" "নাঃ, আমি আর পড়াইব না, অন্য লোক দেখুন।" "কি হইয়াছে বলুন্‌ই না"—অনেক কষ্টে মাষ্টার মহাশয়ের নিকট হইতে প্রকাশ পাইল যে, তিনি দ্বিপ্রহরে আহারের পর যখন একটু বিশ্রাম করিতে-ছিলেন, সেই অবসরে পুত্র তাঁহার চশ্‌মার খাপ হইতে চশ্‌মা বাহির করিয়া চোখে পরিতে গিয়া দুইখানা কাঁচই ভাঙ্গিয়া চূরমার করিয়া ফেলিয়াছে।

রমাকান্ত আর একটিও কথা না বলিয়া পুত্রের নিকট গমন করিলেন, তাহার হাত ধরিয়া হিড়্ হিড় করিয়া টানিয়া একটি ছোট

অন্ধকার ঘরের মধ্যে তাহাকে আনিয়া ফেলিলেন, সেখানে তাহার মাথার উপরে একটা প্রকাণ্ড ভারী বই চাপাইয়া দিয়া বাহির হইতে শিকল্ টানিয়া দিলেন এবং নিজে ঘরের পার্শ্বে চুপ্‌টি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ছেলে চীৎকার করিতে লাগিল, "ও বাবা, আমি আর কর্‌ব না, কখ্‌খনো কর্‌ব না বল্‌চি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি খুলে দাও, গেলুম!" চীৎকারে বাড়ি ফাটিতে লাগিল। পাঁচ মিনিট অনবরত চীৎকারের পর বালকের কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল—অবশেষে এমন হইল যে, রমাকান্তও সে স্বর আর শুনিতে পাইলেন না। রমাকান্ত একবার ভাবিলেন, "খুলিয়া দিই", আবার মনে হইল, "না, যথেষ্ট শাস্তি হয় নাই, এখনই আবার ভুলিয়া যাইবে,"—এমন্ সময়ে রমাকান্তের মা হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া রমাকান্তকে ঠেলিয়া শিকল্ টানিয়া খুলিয়া অবসন্ন

মূর্চ্ছিতপ্রায় বালককে বুকে আগ্‌লাইয়া ধরিয়া "এমন্‌ও কর্‌তে হয়, ছেলেটাকে এমন্‌ও কর্‌তে হয়," বলিতে বলিতে অন্তঃপুরে তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। রমাকান্ত মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে নিজ কক্ষে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন—চোখ দিয়া ঝরঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল—বালকের ন্যায় অধীরভাবে কাঁদিতে লাগিলেন।

২

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। রমাকান্ত কাল ছেলেকে স্কুলে ভর্ত্তি করিবেন ঠিক করিয়াছেন—নূতন খাতাপত্র বই সব কিনিয়া দিয়াছেন। ছেলের আনন্দ ও উৎসাহ আর ধরে না। সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া রাত্রে রমাকান্ত শয়ন করিয়াছেন, হঠাৎ তাঁহার একটু জ্বরের মত দেখা দিল—ক্রমশঃ সেই জ্বর বাড়িতে লাগিল। প্রাতে ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া ঔষধপত্র কিছুই দিলেন না, বলিলেন,

তিন দিন না দেখিয়া তিনি কোনও ব্যবস্থা করিবেন না। তখন সহরে বসন্তের অতিশয় প্রকোপ, হাজার হাজার লোক মরিতেছে। রমাকান্তের জন্য সকলের ভয় হইল।

তৃতীয় দিনে রমাকান্তের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া বসন্ত-গুটিকা দেখা দিল। অবস্থা ক্রমশঃ সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার পর্য্যন্ত আর সে ঘরে ঢুকিতেন না, দূর হইতে রোগীকে দেখিয়া চলিয়া যাইতেন। ডাক্তার সকলকে রমাকান্তের ঘরের দিক্‌ একেবারে মাড়াইতে নিষেধ করিলেন, বিশেষতঃ সেই ছোট ছেলেটিকে যেন অন্তঃপুর হইতে কোনও মতে বাহিরে আসিতে না দেওয়া হয় এই কথা বারম্বার বলিয়া দিলেন।

রমাকান্তের মাতা কাহারও নিষেধবার্ত্তা না শুনিয়া দিবারাত্র প্রাণপণে পুত্রের সেবা করিতে লাগিলেন। ছেলেটি অন্তঃপুরে তাহার পিসিমার নিকটেই থাকিত।

সাতদিনের পর রমাকান্তের অবস্থা একটু ভাল বোধ হইতে লাগিল, ডাক্তারও আশা দিল।

*　　*　　*

তখনও অসুখ ভাল করিয়া সারে নাই। রমাকান্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়াছিল, পার্শ্বে মাতা বসিয়া ব্যজন করিতেছিলেন। শিশু যেমন্ মায়ের কোলে সর্ব্বাঙ্গ এলাইয়া দিয়া আচ্ছন্নভাবে পড়িয়া থাকে, রমাকান্ত মায়ের কোলে একখানি হাত এলাইয়া দিয়া সেইরূপ-ভাবে পড়িয়া ছিল। স্বপ্নও নহে, জাগরণও নহে,—রমাকান্তের মনে হইতেছিল কে যেন তাহাকে জীবনের এপার হইতে ওপারে সজোরে দোল্ খাওয়াইতেছে ;—তাহার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছিল ;—হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া চোখ খুলিয়া রমাকান্ত দরজার কাছে কি একটা ছায়ার মত দেখিলেন। ক্ষীণ দৃষ্টি প্রাণপণে প্রসারিত করিয়া রমাকাঁন্ত দেখিলেন, তাঁহারই

পুত্র করুণ নয়নে একদৃষ্টে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। রমা-কান্তের বুঝিতে বাকী রহিল না—নিষেধসত্ত্বেও বালক লুকাইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছে। প্রায় দুই মিনিট্ কাল এইরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বালক আস্তে আস্তে চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার দুই চোখ যে বেদনা জানাইয়া গেল রমাকান্ত তাহা আর ভুলিতে পারিলেন না—শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমা, অমন্ কর্‌চিস্ কেন বাবা?" রমাকান্ত কহিল, "না মা, কিছু না।"

৩

অসুখ হইতে উঠিয়া রমাকান্ত সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণের ন্যায় সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত আকারে দেখা দিল। রমাকান্ত আর সে রমাকান্ত নাই,—সে রাগ নাই, সে রুক্ষ মেজাজ্ নাই, রমাকান্ত এক্ষণে নিতান্ত শান্ত

নিরীহ ভালমানুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুত্রকে রমাকান্ত জননীবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন ;—দুই হাত ভরিয়া তাহাকে জিনিষপত্র কিনিয়া দিতে লাগিলেন, পড়াশুনার জন্যও তাহাকে আর পূর্ব্ববৎ শাসন করিতেন না,—সকল বিষয়ে তাহাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। হঠাৎ পিতার এই ভাবান্তর, স্নেহ-প্রাবল্যের কারণ ঠিক্ করিতে না পারিয়া পুত্রও যেন কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া পড়িল।

এইরূপে কিছুদিন যায়। বালকটি রাত্রে ঠাকুরমার কাছেই শুইত; ঠাকুরমা আসিয়া গল্প বলিতেন তবে সে ঘুমাইত।

সে দিন ঠাকুরমা আসিয়া দেখিলেন, বালক ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, দুই একবার ডাকিয়াও সাড়া পাইলেন না। অন্যান্য দিনের ন্যায় বৃদ্ধা বুকের কাপড়টি বালকের গায়ে দিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া শুইতে

গিয়া দেখিলেন, বালকের গা আগুনের মত তাতিয়াছে। তাঁহার মনে মনে ভয় হইল, কিন্তু সে রাত্রে আর রমাকান্তকে কিছু জানাইলেন না—নিজেই সজাগ হইয়া রহিলেন।

মাঝরাত্রে বালকটি কিছু বেশী ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল, দু'একটা ভুল বকিতেও লাগিল।

ভোর হইতে না হইতে মাতা ছুটিয়া গিয়া পুত্রকে খবর দিলেন। পুত্রের অসুখ-বার্ত্তা শুনিয়া রমাকান্তের মাথা ঘুরিয়া গেল—এতদিন মনে মনে সে যে আশঙ্কা করিয়া আসিতেছিল তাহাই ঘটিল না কি, সংক্রামক রোগে তাহাকে ধরিল না কি! অসুখের সময় বালক যে দিন লুকাইয়া তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিল সেইদিনকার কথা রমাকান্তের মনে পড়িল; এক্‌টার পর এক্‌টা দুশ্চিন্তা আসিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

ডাক্তার আসিলে রমাকান্ত পূর্ব্ব হইতেই বলিতে লাগিলেন, "উহার আর একবার এই-রূপ জ্বর হইয়াছিল," "বোধ হয় রৌদ্রে দৌড়া-দৌড়ি করিয়া এইরূপ হইয়া থাকিবে," "গায়ে হাতে কোন ব্যথা নাই"—ইত্যাদি। কিন্তু ডাক্তার যখন ভাল করিয়া দেখিয়া অন্যরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন তখন রমাকান্তের মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। রমাকান্তের তখনকার আকুলতা অস্থিরভাব দেখিয়া ডাক্তারেরও মনে কষ্ট বোধ হইল।

জ্বর কিছুতেই কমিল না—অসহ্য যন্ত্রণায় বালক ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। বসন্ত ভিতরে বসিয়া যাইবার লক্ষণ সকল একে একে প্রকাশ পাইল—বিকার পূর্ণমাত্রায় দেখা দিল।

ডাক্তার, বৈদ্য, ঝাড়ঝোড়, শীতলাপূজা রমাকান্ত কিছুই বাকী রাখিলেন না—কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আর আশা নাই—রাত্রি বুঝি আর কাটে না। নিস্তব্ধ রজনীতে

তিনটি প্রাণী প্রাণহীনভাবে ঘরের মধ্যে বসিয়া কেবল একমনে ডাকিতেছেন, "ঠাকুর, রক্ষা কর, ঠাকুর, রক্ষা কর!"

ঠাকুর কি কথা শুনিলেন! ভোরের দিকে বালক একবার চোখ মেলিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিল—যেন কাহাকে খুঁজিতেছে, কি বলিতে চাহিতেছে,—তাহার ঠোঁট থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল,—হঠাৎ সবেগে উঠিয়া বসিয়া "বাবা, খুলে দাও, খুলে দাও, দুটি পায়ে পড়ি খুলে দাও, আর কথ্‌খনো ক'রব না, আর কথ্‌খনো ক'রব না!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—তাহার পর ধীরে ধীরে অবসন্নদেহে বাবার কোলে ঢলিয়া পড়িল।

* * *

কত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে;—ঝড় নাই, বৃষ্টি নাই, প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে দেখা যাইত এক অকালবৃদ্ধ খালিপায়ে মলিনবেশে কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঠাকুরের

দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া যোড়করে গল-লগ্নীকৃতবাসে বলিতেছে, "দয়া কর, ঠাকুর, দয়া কর, তোমার সেই রূপ একবার দেখাও, যাহাতে আমি তোমার মধ্যেই তাহাকে এক-বার দেখিতে পাই,—বড় অনাদরে সে চলিয়া গিয়াছে—তাহাকে একবার দেখাও, ঠাকুর, তাহাকে একবার দেখাও !"

দুঃখের বোঝা।

১

ভাই সতীশ,

তোমার চিঠি পেয়ে সমস্ত অবস্থা জেনে ভারি কষ্ট হ'ল। তুমি কাগজ উঠিয়ে দিয়ে একটি কাজের চেষ্টা দেখ। আর কতদিন এমন চল্‌বে?

আমার একটা কথা রাখ্‌বে? ঐ ভূতের বোঝাটা ছাড়। ঐটেই যত সর্ব্বনাশের মূল। সত্যি বল্‌চি, তুমি যখন ঐ ধুচুনিটা মাথায় চাপাও, আমার মনে হয় যেন দুঃখের বোঝাই মাথায় ক'রলে। আমার এমন কষ্ট বোধ হয় যে, কি আর বলব! বাঙ্গালীর ছেলে ধুতি চাদর দেশী কাপড় পরবে তা' না, হ্যাট্‌-কোট্‌ পরে' ফিরিঙ্গির মত হট্‌হট্‌ ক'রে' বেড়ান কি!

তুমি ত "ও কিছু না, খেয়াল," বলে' হেসে উড়িয়ে দাও, কিন্তু আমার যে চোখে জল আসে। আচ্ছা, এই যে মাকে ভালবাসি, বাবাকে ভালবাসি, তোমাকে ভালবাসি, খোকাকে ভালবাসি,—এও তা'হ'লে একটা খেয়াল? তা' যদি হয়, তা'হ'লে এ রকম খেয়াল যেন জন্ম জন্ম থাকে—এই খেয়ালের জোরে পৃথিবী চল্‌চে। দেশ বলে' ত একটা জিনিস আছে। শাস্ত্রে বলে জন্মভূমি মায়ের মতন। যে জন্মভূমিকে সত্যি সত্যি ভালবাসে, সে ওরকম বিদেশী সঙ্‌ সাজ্‌তে পারে না। রাগ কোরো না ভাই, তোমাদের হ্যাট্‌কোট্‌ প'রলে কি রকম দেখায় জান,—ঠিক যেন একটা বাজপড়া পোড়ো বাড়ীর মত। একে ত দেশের এই দুর্দ্দশা—সেটাকে আর ফুটিয়ে তুলে লাভ কি?

সুবিধে? অমন্‌ সুবিধেকে—কি আর বল্‌ব! তা'হ'লে সেবার যখন ভট্‌চার্য্যের

ছেলেটা পাঁচিল টপ্‌কিয়ে দুটো কাঁঠাল নিয়ে তার সুবিধে ক'রলে, তখন অত রেগেছিলে কেন? আর, খেতে ব'সে বেরাল যখন সুবিধে বুঝে মাছের ঝোলের মাছটা নিয়ে পালায় তখন অত চট কেন? বুড়ি দিদিমাও ঘর জুড়ে বসে আছেন—তাঁকে রাখ্‌তে যদি সুবিধে না হয় ত দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দাও না কেন,—আর ছোট বৌ লিখ্‌তে বল্‌চে তাকে নিয়ে ঘর ক'রতে যদি সুবিধে না হয়, তা' হলে আর দু'দশটি বড় ঘরের ঝিকে নিয়ে আস্‌তে। মাথা খাও, আমার এই কথাটা রাখ,—আর সাহেব সেজো না; মায়ের মুখে আর চুণকালী মাখিও না! লক্ষ্মীটি, এবারে গিয়ে যেন তোমায় অন্যবেশে দেখি। বল ত এখান থেকে শান্তিপুরে ধুতি চাদর পাঠিয়ে দিই।

খোকা ভাল আছে। বিমলা মাসীর মাঝে ভারি অসুখ হয়েছিল, এখন অনেকটা ভাল আছে। তুমি এখনও কি মেসে আছ?

থাওয়া-দাওয়ার ত' কোন কষ্ট হয় না? পত্রের আশায় রহিলাম।

তোমার বৌদিদি

রাধারাণী।

২

বৌদিদি,

তোমার চিঠি পেলুম। তোমার ঐ এক কথা! মান অপমান জ্ঞান ওটা আর কিছুই নয়—স্নায়ুর বিকারমাত্র। একটু অপমান সহ্য করে' যদি সুবিধা পাওয়া যায়—বোকার মত সেই সুবিধেটাকে ছাড়ি' কেন বল। ইংরাজ বল, জার্ম্মান বল, রুষ বল, সবাই সুবিধে বোঝে বলে' এত বড় জাত। এই যে তোমরা মান অপমান ভাসিয়ে দিয়ে লজ্জার মাথা খেয়ে কথায় কথায় নাকিসুরে কান্না ধর, সেটাও কি নিজেদের সুবিধা—কিছু আদায় করবার মতলবে নয়? যদি হ্যাট্-কোট্ পরে' ট্রেণে ট্র্যামে, পথে সুবিধা মান-

সম্ভ্রমটি পাওয়া যায় তাতে ক্ষতি কি? তোমরা মেয়ে মানুষ, অত শত বুঝবে না, চুপ করে' থাকাই ভাল। তোমরা পালপার্ব্বণ আর ভাতের হাঁড়ির কাঠি নিয়ে নাড়াচাঁড়া কর।

আমি ভারি বিপদে পড়েচি—একটা উপকার করবে কি? আমার কাগজ ত উঠে যায়, এ দিকে দেনার জ্বালায় অস্থির হ'য়ে পড়েচি। পত্রপাঠ যদি দাদার কাছ থেকে দু'শ টাকা পাঠিয়ে দিতে পার ত এ যাত্রা রক্ষা পাই। টাকা যদি না পাও ত তোমার সোণার দুই চারিটা গয়না লুকিয়ে পাঠিয়ে দিও—আমি বন্ধক দিয়া টাকা ধার করিব। তোমার ভয় নাই, আমি শীঘ্রই আবার গয়না ছাড়াইয়া লইয়া তোমার নিকট ফেরৎ পাঠাইব। দেখো, কেহ যেন টের না পায়। বৌদিদি, তুমি এ দুঃখের বোঝা না নামাইলে কে আর নামাইবে!

আমি এখনও মেসে আছি। খাওয়া-

দাওয়া একপ্রকার চলিতেছে। তোমরা কে কেমন আছ লিখ।

তোমার ঠাকুরপো
সতীশ।

৩

ভাই সতীশ,

আজ মনি-অর্ডার করিয়া দু'শ' টাকা পাঠাইলাম। আমার আর ভাই নেই, তুমিই আমার একমাত্র স্নেহের পাত্র, তোমার কষ্টের কথা শুনলে আমার বুক ফেটে যায়। তুমি অমন্ করে' চিঠি লিখ্‌লে কেন,—আমি কি তোমার উপকার করতে কখনও কুণ্ঠিত? ভাই, তুমি শীঘ্র একটা কাজের চেষ্টা দেখ, তোমাকে থিতিয়ে বস্‌তে দেখ্‌লে আমি নিশ্চিন্ত হই।

তুমি ঠিক্ বলেছ আমরা মূর্খ মেয়ে-মানুষ, আমাদের মুখে কোন কথাই শোভা পায় না, কিন্তু না বলে'ও যে ভাই থাকতে পারিনে

তুমি যে লিখেছ অন্যান্য জাতি সুবিধা বোঝে বলে' এত বড় জাত হ'য়েচে—সে ঠিক্ কথা। কিন্তু তাদের সুবিধা বোঝা আর তোমাদের সুবিধা বোঝায় অনেক প্রভেদ। তাদের সব সুবিধা বোঝাই হ'য়ে স্বদেশের জন্য চালান হয়। যখন নিজ নিজ সুবিধা আর সমস্ত দেশের সুবিধায় লড়াই বাধে, তখন দেশের সুবিধাটিরই জিত হয়। স্বার্থপরতা সকল সময়েই খারাপ, কিন্তু দেশের প্রতি ভালবাসা অনেক সময়ে স্বার্থপরতার পানা-পুকুরকে পদ্মের মত ঢেকে রাখে—তার মলিনতা অনেকটা দূর করে' দেয়। তোমরা কেবল নিজের নিজের ছোটখাট নীচ সুবিধা নিয়ে ব্যস্ত, দেশের মুখের পা[illegible] ভুলেও ত তাকাও না। হ্যাট্‌কোট্ প'রলে কোথায় ট্রেণে ট্রামে একটু সুবিধা হয়, একটু বেশী খাতির পাওয়া যায়, তার জন্যে সঙ্ সাজতেও প্রস্তুত। আমরা যে কথায় কথায়

নাকিস্থরে কান্না ধরি লিখেছ, সে অতি নিভৃতে যাদের ভালবাসি তাদের কাছে—যেখানে হীনতা নেই, লজ্জা নেই, মান অপমান কিছুই নেই।

পালপার্ব্বণ ব্রত ধর্ম্মকর্ম্মটা কি ভাই এতই খারাপ জিনিস হ'ল ? সংসারের যেটুকু শ্রী আছে জেনো, সে শুধু এ সব করা হয় বলে'। এ ত আর ছেলেখেলা নয়—এতে ঢের ত্যাগ কষ্টস্বীকার ক'রতে হয়, যা' পুরুষমানুষ তোমরা একদিনের জন্যও পার না। এসব করিই বা কার জন্য ?—শুধু নিজের পরকালের সদ্গতির জন্য নয়, স্বামী পুত্র ভাই বোন তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য। আর ভাতের হাঁড়ির কাঠিটা একদিন না নাড়লে তোমাদের যে কি দশা হয় একবার মনে মনে ভেবে দেখ, লিখে আর কি জানাব।

আমরা ভাই যা' আছি তা' বরাবর একই রকম আছি,—রান্না করছি, ঘর ঝাঁট দিচ্ছি,

বাটনা বাট্‌চি, ছেলে মানুষ কর্‌চি,—ভগবান আমাদের যা' কাজ দিয়েছেন তা' প্রাণপণ সাধ্য-মত করে' আস্‌চি। আর তোমরা কি করচ? এ সব ঝগড়া বা জাঁকের কথা নয়—এ সব সত্যি কথা। কথা উঠ্‌লে কথা বল্‌তে হয়।

তোমার ভাই যা' ইচ্ছা কর—আর কিছু বল্‌বো না। তবে এই কথা বলে' রাখ্‌চি একদিন না একদিন তোমার ভুল ভাঙবে, চোখ ফুট্‌বে, অনুতাপ হবে। বৌদিদির কথা মনে রেখো।

মাসী ভাল আছেন। বাবা কাল এসেছেন। তুমি এর মধ্যে একদিন এসে দেখা করে' যেও। আমাদের খবর একপ্রকার ভাল। তোমার খবরের আশায় রইলুম। ইতি

তোমার বৌদিদি।

*   *   *

৪

বৌদিদি,

অনেক দিন পরে আবার তোমাকে চিঠি

লিখ্‌চি। তোমার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হ'য়েচে। তোমারই জিত।

আজ দিন চার হ'ল প্রাণে মারা যেতে যেতে বেঁচে গেছি। টালার দাঙ্গাহাঙ্গামার কথা শুনেছ ত। কতকগুলি মুসলমান একেবারে ক্ষেপে উঠেছিল—সাহেব দেখ্‌লেই মার্ মার্, করে' তেড়ে যায়, অনেক সাহেবকেও জখম করেচে। শেষকালে কেল্লা থেকে সৈন্য আনিয়ে তবে দাঙ্গা থামে। আমি ছাপাখানা থেকে হেঁটে আস্‌ছিলুম—মেসের কাছাকাছি এসেছি এমন সময় আমার হ্যাট্‌কোট্ দেখে একজন মুসলমান ইট্ নিয়ে আমাকে তাড়া করে। আমি দৌড়ে মেসে পালিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে' তবে বাঁচি। তখনো তারা বাড়ীর উপর ঢিল ছুঁড়্‌তে থাকে। আমি তাড়াতাড়ি কোট্ প্যাণ্ট্‌লুন খুলে কাপড় প'রতে যাই—দেখি, একখানাও ধুতি নাই, সবই ইজার প্যাণ্ট্‌লুন। ভাবি মুস্কিলে

পড়্‌লুম। শেষে দেখি ঘরের এককোণে তোমার ছেঁড়া শাড়ীবাঁধা একটা পুঁটলি রয়েছে,—আমি তাড়াতাড়ি সেই শাড়িটি খুলে, পরে', বারান্দায় এসে সেই লোকদের বলি যে, আমি সাহেবও নয়, ফিরিঙ্গিও নয়, আমি বাঙ্গালী,—তবে রক্ষা পাই; তোমার ছেঁড়া শাড়িটা এ যাত্রা আমাকে খুব রক্ষা ক'রেচে।

হ্যাট্‌কোট্‌ সব পুড়িয়ে ফেলেচি। তুমি ওগুলোকে যে "দুঃখের বোঝা" বল্‌তে সে ঠিক কথা, এখন বুঝ্‌তে পারচি। হ্যাট্‌কোটের চেয়ে আমাদের ছেঁড়া ধুতিই ভাল।

আমি শীঘ্রই দেশে যাচ্চি। আমার বেশ পরিবর্ত্তন দেখে' খুব খুসী হবে—না? দেখা হ'লে আর আর কথা বল্‌বো।

তোমার ঠাকুরপো

সতীশ।

দাদা।

১

সংসার ক্ষুদ্র, সম্পত্তিও যথেষ্ট, তথাপি রায় মহাশয় এবং তাঁহার গৃহিণী উমাসুন্দরীর মনে সুখ ছিল না। দেবসেবা, পূজার্চ্চনা, ঔষধ-ধারণ, ঠাকুরের মানত উমাসুন্দরী কত কি করিলেন তথাপি তাঁহার ভাগ্যচক্র ফিরিল না। যৌবন-সীমা অতিক্রম করিয়া উমাসুন্দরী যখন প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করিলেন তখন পাড়া-প্রতিবাসী সকলেই স্থির করিলেন উমাসুন্দরী বন্ধ্যা। কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধ! ত্রিশ বৎসর বয়সে রায়গৃহিণী একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করিলেন। গৃহ আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। রায় মহাশয় আদর করিয়া পুত্রের নাম রাখিলেন "মাণিক"।

বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র পুত্র মাণিকের আদর ও যত্নের সীমা ছিল না। তাহার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রায় মহাশয় তাহার সমস্ত আব্দার সহ্য করিতে লাগিলেন,—সোণার বোতাম, সোণার চেন, সোণার ঘড়ি, জুতা জামা ছড়ি, মাণিক যখন যাহা বায়না ধরিতে লাগিল রায় মহাশয় মুহূর্ত্তে নির্ব্বিচারে তাহা সরবরাহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মাণিক পিতার অত্যাদরে দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিল। রায় মহাশয় তাহাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

২

মাণিক রোজ গাড়ি করিয়া স্কুলে যায়, স্কুলে টিফিনের সময় মাতার স্বহস্তপ্রস্তুত আহার্য্য লইয়া ভৃত্য প্রত্যহ তাহাকে খাওয়াইয়া আসে। স্কুলে টিফিনের সময় প্রায় সকল বালকই দোকানের খাবার কিনিয়া খাইত, তাহারা মাণিকের আহারের ঘটা দেখিয়া অবাক হইত। মাণিক দেখিত টিফিনের

সময় তাহাদের ক্লাসের সকল ছেলেই খায় কেবল একটি ছেলে কিছুই খায় না—ছুটির সময়ও ক্লাসে বসিয়া বসিয়া পড়া মুখস্ত করে। মাণিকের কৌতূহল জাগিয়া উঠিল। একদিন আহারের পর মাণিক আস্তে আস্তে বালকটির কাছে গিয়া কহিল, "তোমাকে কোন দিন খাইতে দেখি না কেন? তুমি কিছু খাও না কেন?" বালক উত্তরে কহিল, "খাবার কোথায় পাব?" তাহার সহিত একত্রে পড়ে, এক বেঞ্চে বসে, ভদ্রলোকের ছেলে, টিফিনের সময় তাহার খাবার জুটে না মাণিক ইহা কোনমতেই ধারণায় আনিতে পারিল না। সে কহিল, "কেন, আমার মা ত আমার জন্য খাবার পাঠিয়ে দেয়, তোমার মা তোমার জন্য খাবার পাঠিয়ে দেয় না কেন?"—মায়ের নাম শুনিয়া বালকের চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল, সে আস্তে আস্তে কহিল, "আমার মা নাই।" কথাটা মাণিকের প্রাণে গিয়া বাজিল,

সে কহিল, "তুমি আমাদের বাড়িতে যাবে? আমার মা তোমাকে খুব যত্ন করবে।" "বাড়ীতে বলে ত যাব" এই কথা বলিয়া বালক পুনরায় পাঠে মনোনিবেশ করিল।

৩

তাহার পরদিন বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করিয়া স্কুলের ছুটির পর সুকুমার—ছেলেটির নাম সুকুমার—মাণিকের সহিত তাহাদের বাটীতে গেল। মাণিক সুকুমারকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে তাহার মাতার নিকট লইয়া গিয়া কহিল, "মা, এ আমাদের স্কুলের ছেলে, টিফিনের সময় কিছু খায় না; এর মা নেই, আমি সঙ্গে করে' একে এনেছি।" "বেশ করেছ বাছা, বেশ করেছ", "বস বাছা বস" বলিয়া মাতা সুকুমারের মুখচুম্বনপূর্ব্বক তাহাকে বসাইলেন। পরে তাহার অঙ্গ ধৌত করিয়া দিয়া স্বহস্তে জলখাবার আনিয়া তাহাকে খাওয়াইলেন। আহারের পর এ কথায় সে কথায়

মাণিকের মাতা জানিতে পারিলেন সুকুমার শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন, দূর-সম্পর্কীয় এক মামা তাহাকে মানুষ করিতেছেন। মামারও অবস্থা শোচনীয়;—স্কুলে মাষ্টারী করিয়া সকাল সন্ধ্যা ছেলে পড়াইয়া কোনরূপে কষ্টে সংসার নির্ব্বাহ করিতেছেন। মাণিকের মাতার মনে বড়ই কষ্ট বোধ হইল, তিনি স্নেহার্দ্রস্বরে বালককে কহিলেন, "বাছা, তোমার যখন সুবিধা হয় এখানে এস, তোমার যখন যাহা দরকার আমাদের নিকট চাহিয়া লইও। আমাকে তোমার আপন মা বলিয়া জানিও।" তাহার পর মাণিককে কাছে ডাকিয়া কহিলেন, "বাবা, আজ হ'তে একে এক মায়ের পেটের ভাই বলে' জেনো, একে দাদা বলে' ডেকো।" মাণিকের পিতার সহিত দেখা করিয়া সুকুমার সেদিন যখন বিদায় গ্রহণ করিল, মাণিকের মাতা অন্তরে বাৎসল্য-বেদনা অনুভব করিলেন।

অল্পকালমধ্যেই সুকুমার ও মাণিকের বন্ধুত্ব জন্মিল। মাতার কথামত মাণিক সুকুমারকে "দাদা" বলিয়া ডাকিত এবং সুকুমারও মাণিকের মাতাকে মা বলিয়া ডাকিত। সুকুমার স্কুলের ছুটির পর প্রায় প্রত্যহই মাণিকের বাড়িতে আসিতে লাগিল—সমস্ত বিকালটা মাণিকের সহিত খেলা করিয়া সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিয়া যাইত।

৪

এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। এক-দিন সুকুমারের মামা রায় মহাশয়ের সহিত দেখা করিয়া কহিলেন, "সুকুমারকে আপ-নারা যেরূপ আদর-যত্ন করেন—বলিতে সাহস হয় না—আমার পশ্চিমে একটা কাজ জুটিয়াছে—আপনারা যদি দয়া করিয়া সুকুমারকে আপনাদের এখানে একটু স্থান দান করেন তাহা হইলে—।"—কথাটা শেষ হইতে না হইতেই রায় মহাশয় অতি

আনন্দের সহিত তাঁহার সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

মামা চলিয়া গেলে সুকুমার রায় মহাশয়ের বাটীতে উঠিয়া আসিল। রায় মহাশয় তাহার জন্য একটি ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন,— মাণিকের সহিত তাহার পড়াশুনা আহারাদিরও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সুকুমার রায়-পরিবারের একজন ঘরের ছেলের মত হইয়া রহিল।

রায় মহাশয় প্রত্যহ অপরাহ্ণে বারাণ্ডায় বসিয়া বসিয়া দেখিতেন দুই বালক বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—সুকুমার স্বেচ্ছায় মাণিকের সমস্ত কাজ করিয়া দিতেছে; মাণিক ফুল ভালবাসিত—সুকুমার গাছে চড়িয়া মাণিকের জন্য ফুল পাড়িয়া দিতেছে, বাখারি চাঁচিয়া মাণিকের জন্য তীরধনুক প্রস্তুত করিয়া দিতেছে, কুস্তিঘরে গিয়া মাটি ঠিক করিয়া দিতেছে। রায় মহাশয় বসিয়া বসিয়া

দেখিতেন ও ভাবিতেন, "আমার অবর্ত্তমানে মাণিকের তবু একজন দেখিবার লোক, অভিভাবক হইল,"—মনে মনে অনেকটা শান্তি অনুভব করিতেন।

কিন্তু এত শীঘ্র যে সুকুমারকে অভিভাবক-স্বরূপ রাখিয়া রায় মহাশয় চিরশান্তি লাভ করিবেন তাহা কে জানিত! বহুদিন যাবৎ রায় মহাশয় স্নায়ুরোগে ভুগিতেছিলেন, রোগ হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইল। আপন অবস্থা বুঝিতে পারিয়া রায় মহাশয় মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে মাণিককে ডাকিয়া বুকের কাছে টানিয়া কহিলেন, "মাণিক, আমার ত দিন ফুরাইয়াছে, তোমাদের যে ভালয় ভালয় রাখিয়া যাইতে পারিলাম এই আমার সুখ। বিষয়সম্পত্তি যাহা আছে তাহাতে তোমাদের জীবনে কোন কষ্ট হইবে না। কিন্তু বুঝিয়া চলিও। অসৎসংসর্গে মিশিও না। তোমার দাদার পরামর্শ লইয়া

সমস্ত কাজ করিও—কখনও তাহাকে অমান্য করিও না।” তাহার পর সুকুমারের দুটি হাত ধরিয়া বাষ্পজড়িত কণ্ঠে কহিলেন, “বাবা সুকুমার, মাণিকের সমস্ত ভার তোমার উপর দিলাম, ও ছেলে-মানুষ, কিছু দোষ করিলেও ছোট ভাই বলিয়া উহাকে ক্ষমা করিও, বিপদ আপদে উহার সহায় হইও।”—রায় মহাশয়ের আর বাক্‌স্ফূরণ হইল না। সেইদিন রাত্রেই রায় মহাশয় সকলকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

৫

রায়মহাশয়ের মৃত্যুর কিছুকাল পর হইতেই মাণিকের স্বভাবের পরিবর্ত্তন দেখা গেল। পিতার জীবদ্দশায়ই মাণিক একরূপ সংসারের কর্ত্তা ছিল, পিতার মৃত্যুর পর সে একেবারে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া দাঁড়াইল; অপ্রতিহত ক্ষমতার আস্বাদ লাভ করিয়া সে আর আপনাকে ঠিক রাখিতে পারিল না,

ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে লাগিল,—ক্রমে ক্রমে অধঃপাতের চরম সীমায় গিয়া পৌঁছি

সুকুমারের সহিত মাণিকের প্রীতি ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিল,—সুকুমার যত মাণিকের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে চাহিত, মাণিক সুকুমারকে তত দূরে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিত;—ক্রমে নিশাচরের নিকট আলোকের ন্যায় সুকুমারের সঙ্গ মাণিকের একেবারে দুঃসহ হইয়া উঠিল। বন্ধুবান্ধব চতুর্দ্দিক হইতে ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া ফুৎকার দিতে লাগিল—সুকুমারের প্রতি মাণিকের বিদ্বেষ-বহ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। মাণিক সুকুমারকে "দাদা" বলিয়া আর ডাকিত না, নিতান্ত আশ্রিত অনুগতের ন্যায় তাহার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে লাগিল। সুকুমার মাণিকের সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য করিত।

মাণিকের ব্যবহারে মাণিকের মাতা কিন্তু

বড়ই কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। একদিন সুকুমারকে কাছে ডাকিয়া মাণিকের মাতা কহিলেন, "বাছা, মাণিক তোমার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করে, তুমি কিছু মনে কোরো না। ও ছেলেমানুষ, ছোট ভাই বলে' ওর সব দোষ মাপ কোরো—ওর যাতে মতিগতি ফেরে একটু দেখো, তুমি ছাড়া ওর আর কেউ নেই"—বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। সুকুমার কহিল, "মা, আপনি কিছু ভাবিবেন না, আমার প্রাণ থাকিতে আমি মাণিককে পরিত্যাগ করিব না।"

সুকুমারের সহস্র চেষ্টাসত্ত্বেও কিন্তু মাণিক ফিরিল না। অবশেষে এইরূপ দাঁড়াইল যে, গৃহমধ্যেই মাণিক বন্ধুবান্ধব লইয়া নানারূপ ব্যভিচার আরম্ভ করিল।

একদিন সুকুমার আর থাকিতে পারিল না, বন্ধু-বান্ধবের সমক্ষে মাণিকের নিকট

গিয়া কহিল, "মাণিক, তোমার পিতার শেষ কথাটা একবার স্মরণ কোরো, আমি যদিও তোমাদের কেউ নই, তবুও তোমাকে বলিবার আমার অধিকার আছে, তুমি—।" কথাটা শেষ হইতে না হইতে মাণিকের বন্ধুগণের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, "যাও! যাও! ঢের হইয়াছে, তোমার আর অত চালাকি করিতে হইবে না।"—সকলে হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল, মাণিকও সেই হাসিতে যোগ দিল। সুকুমার আর একটিও কথা না বলিয়া ফিরিয়া আসিল—মর্ম্মভেদ করিয়া তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

এইরূপে স্নেহ ও অবজ্ঞার দ্বন্দ্বকোলাহলে দিন কাটিতে লাগিল। সুকুমার একদিন দেখিল মাণিক সাজসজ্জা করিয়া বন্ধুবান্ধব লইয়া ঈষৎ মত্ত অবস্থায় বাড়ির বাহির হইতেছে। সুকুমার সন্ধান লইয়া জানিল মাণিক দমদমায় তাহার এক বন্ধুর বাগান-বাড়িতে আজ পার্টি দিতেছে।

অমঙ্গল আশঙ্কায় সুকুমারের গা ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিল, সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া লুকাইয়া তাহাদের পিছু লইল। মাণিক দলবল সহ ষ্টেশনে গিয়া ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠিল, সুকুমার তাহাদের অজ্ঞাতসারে গোপনে থার্ড ক্লাসে চড়িল।

দম্‌দমায় পৌঁছিয়া গলাধরাধরি করিয়া বিচিত্র হাস্যকলরব তুলিয়া সকলে মিলিয়া হাঁটিয়া চলিল। অল্পদূর গিয়া সোজা পথ ছাড়িয়া সকলে এক মাঠ ভাঙ্গিয়া চলিতে লাগিল। তখন সূর্য্য প্রায় অস্তোন্মুখ, পাখীরা কুলায় ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে, দিবসের কোলাহল থামিয়া আসিয়াছে। প্রকৃতির শান্তি ভঙ্গ করিয়া মত্ত যুবকদল চলিতে লাগিল; চলিতে চলিতে হঠাৎ ও কি!— সকলে সন্ত্রাসে চাহিয়া দেখিল এক ক্ষিপ্ত মহিষ দুই শৃঙ্গ উন্নত করিয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া আসিতেছে।

যে যেদিকে পারিল ছুটিয়া পলাইল। মাণিক আর ছুটিতে পারিল না, সে চীৎকার করিতে লাগিল, "ওগো তোমরা আমাকে ফেলিয়া পালাইও না, আমাকে ফেলিয়া পালাইও না!" কেহ তাহার কথা শুনিল না। গেল! গেল! আর রক্ষা নাই!—এমন সময়ে কে কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া মাণিক এবং ক্ষিপ্ত মহিষের মধ্যে আপনাকে নিক্ষেপ করিল;—মহিষ মুহূর্ত্তে তীক্ষ্ণ শৃঙ্গাগ্রভাগে তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বারবার আঘাত করিয়া চলিয়া গেল। মাণিক নিশ্চল পাষাণবৎ অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল,—তাহার পর ভীতি-বিকম্পিত বক্ষে ধীরে ধীরে আহতের নিকট গমন করিল;—যখন চিনিতে পারিল কে, তখন মাণিক তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া সেই শূন্য প্রান্তর ধ্বনিত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিল, "দাদা!"—আহত অতি ক্ষীণস্বরে উত্তর করিল,

"ভাই !"—মাণিক ডাকিতে লাগিল, "দাদা ! ও দাদা ! ও দাদা !"—দাদা আর কোন সাড়া দিল না।